উম্মাতুন ওয়াহিদাহ

আমরা এক উম্মাহ

ইস্যু - ০১ রজব-১৪৪০ হিজরি

জামাআত কায়িদাতুল জিহাদের অফিসিয়াল ম্যাগাজিন
উম্মাতুন ওয়াহিদাহ- ইস্যু-১ এর নির্বাচিত প্রবন্ধ অনুবাদ

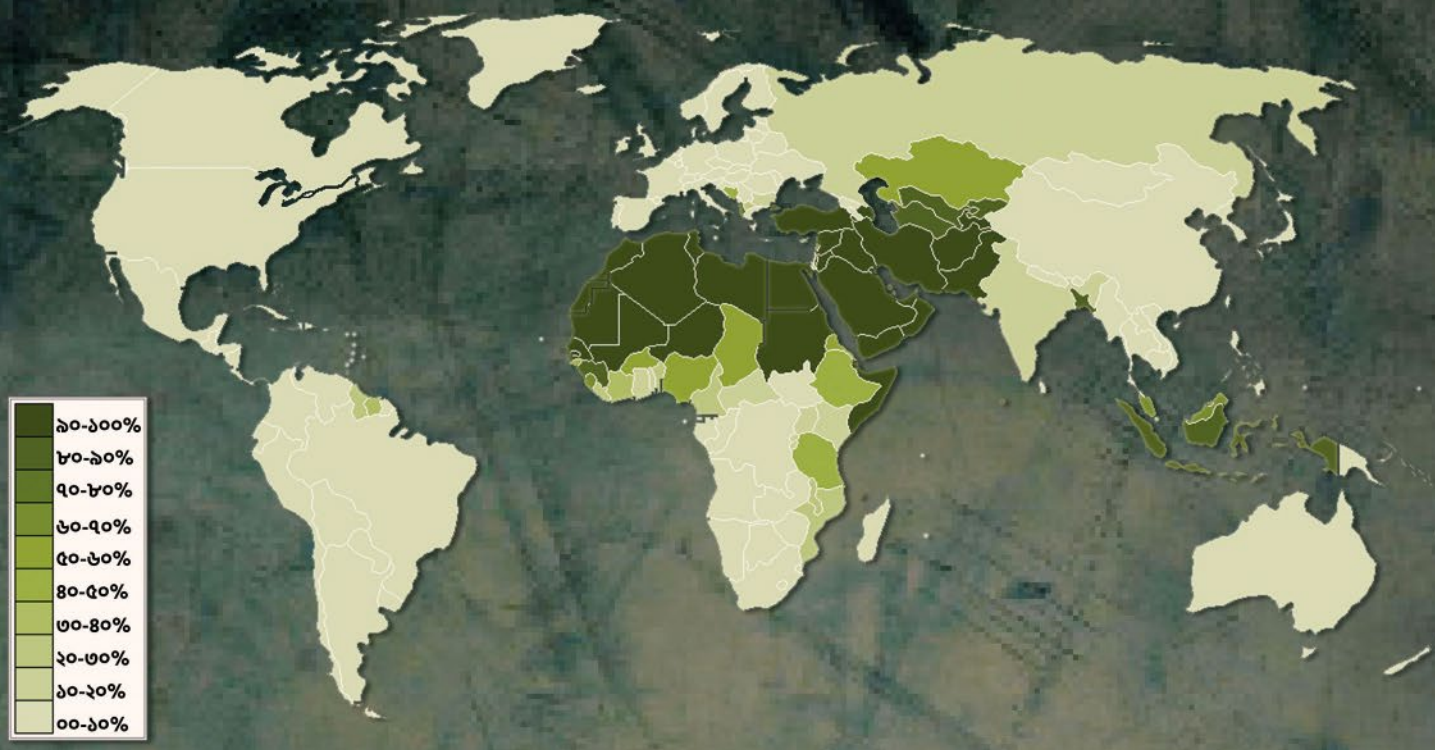

- উম্মাহর মুজাহিদগণ উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করছেন !
- উম্মাতুন ওয়াহিদাহ পরিবারের বার্তা
  "উম্মাতুন ওয়াহিদাহ": মাধ্যম ও টার্গেট
- তাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই!
- মানবাধিকারের নামে পশ্চিমা ক্রুসেডরদের প্রতারণা!

এবং আরো....

AL HIKMAH MEDIA

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ অনুবাদ পরিবার

সম্পাদক- আবু যুবাইদা

সহকারী সম্পাদক- খালিদ আব্দুর রহমান

অনুবাদক

জামিল মাহমুদ
মুহাম্মাদ সালমান
সালাহুদ্দীন
খালিদ সাইফুল্লাহ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আব্দুল কুদ্দুস

প্রকাশের তারিখ:

জুমাদাল ঊলা, ১৪৪২ হিজরি
ডিসেম্বর, ২০২০ ইংরেজি

AL HIKMAH MEDIA

সূচী

০৪. উম্মাহর মুজাহিদগণ উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করছেন!

০৭. উম্মাতুন ওয়াহিদাহ পরিবারের বার্তা
"উম্মাতুন ওয়াহিদাহ": মাধ্যম ও টার্গেট

১৩. তাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই!

১৯. মানবাধিকারের নামে পশ্চিমা ক্রুসেডারদের প্রতারণা

২১. প্রথম আসর:
ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র ফিকহী ধারার মূলকথা

৩১. স্বপ্ন মুমিনের জন্য সুসংবাদ

৩৪. সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ তো নয় যেন
ইহুদীকরণের প্রতিযোগিতা

৩৮. নিরাপত্তা ও দায়িত্ববোধ

৪১. ধ্বংসের মুখে আমেরিকান অর্থনীতি (প্রথম পর্ব)

৪৭. সিরিজ গুপ্তহত্যা

৫২. বন্দী ভাইদেরকে যেন ভুলে না যাই

৫৭. বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান (পর্ব- ০১)

৬২. মনিমুক্তো
উম্মাতুন ওয়াহিদাহ- প্রথম সংখ্যা

AL HIKMAH MEDIA

সম্পাদকীয়

উম্মাহর মুজাহিদগণ উম্মাহর জন্য যুদ্ধ করছেন!

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ! আমার নিকট দাবি জানানো হয়েছে, আমি যেন আমাদের বরকতময় নতুন পত্রিকা "উম্মাতুন ওয়াহিদাহ" এর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখি। আমি এটাকে আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করলাম। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আমি যেন এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।

তাই, আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আমার হৃদয় থেকে নির্গত হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট দু'আ করি, যেন তা মানুষের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছে।

আমার সম্মানিত ও প্রিয় ভাইয়েরা, জেনে রাখুন, জিহাদ হল আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদান ও তাওহিদের কালিমা প্রচার-প্রসারের মাধ্যম, যতক্ষণ না ফেৎনা পরিপূর্ণ নির্মূল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়'। [সূরা আনফাল,৮: ৩৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'তারা এমন, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই হাতে'।[সূরা হজ্জ,২২: ৪১]

এমনিভাবে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে মুসলিমদের পবিত্র বস্তুসমূহ রক্ষা করার জন্য ও মাজলুমদের থেকে জুলুম দূর করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না, অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, যার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক প্রেরণ করুন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাঠান। যারা ঈমানদার, তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। তাই, তোমরা তাগুতের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল'। [সূরা নিসা,৪: ৭৫-৭৬]

তাই, যেকোনো মুজাহিদ গ্রুপের উপর আবশ্যক হল এই ঐশী আদেশকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত না হওয়া, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (٤

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলে বেড়াও যা তোমরা করনা। আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধের বিষয় যে, তোমরা যে কাজ করবে না, তা বলে বেড়াবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সকল লোকদের ভালবাসেন, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় কাতারবদ্ধ হয়ে তার পথে যুদ্ধ করে'। [সূরা আস-সফ, ৬১: ২-৪]

বর্তমানে জিহাদ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বহু দেশের মুসলিমগণ জেগে উঠেছেন। এটি একটি বড় নিয়ামত, যা বিগত কয়েক যুগ ধরে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেনি। তাই আমাদের উচিত, আমাদের গুনাহ ও শৈথিল্যের দ্বারা এ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা না করা। বরং আমাদের যবান, কাজ ও অন্তর দ্বারা এর জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করো। আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞ'। [সূরা সাবা, ৩৪: ১৩]

এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার একটি বড় উপায় হল, আমাদের জাতি যেন কথা ও কাজে আমাদের মাঝে সততা পায়। তাই, আমরা যখন মাশোয়ারার দাওয়াত দিব, তখন আমাদেরকে আমাদের নিজেদের মাঝেও মাশোয়ারার বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যখন উম্মাহকে শরীয়াহ শাসনের দিকে আহবান করব, তখন আমাদের নিজেদেরও উচিত, শরীয়াহর বিচার থেকে পলায়ন না করা।

আমরা যখন দাবি করি যে, আমরা উম্মাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের প্রতিরক্ষা করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরাই যেন তা লঙ্ঘন না করি। এবং আমাদের মুসলিম মুজাহিদ ভাইদের উপর আক্রমণ না করি। আমরা যখন একতার দিকে আহবান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা যেন আমাদের নেতৃবৃন্দের অবাধ্যতা না করি। আমরা যখন শ্রবণ ও আনুগত্যের প্রতি আহবান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরা যেন এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। আমরা যখন প্রতিশ্রুতি ও বায়আত রক্ষার আহবান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা নিজেরা যেন তা ভঙ্গ না করি।

আমরা যখন ভিনদেশী আগ্রাসী কাফেরদেরকে মুসলিম দেশসমূহ হতে বিতাড়নের আহবান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা যেন অন্তঃকলহের মাধ্যমে জিহাদী সমাজকে চুরমার করে না ফেলি। আমরা যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি আহবান করি, তখন আমাদের উপর আবশ্যক হল, আমরা যেন নিজেদের মাঝে তা বাস্তবায়ন করি।

আমরা কি সেই বীরত্বের অধিকারী হতে পারি, যার অধিকারী ছিলেন আমাদের শাইখ, ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ যখন তিনি শাইখ আতিয়্যাতুল্লাহ আল-লিবী রহিমাহুল্লাহ এর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন:

'এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যার প্রতি আমাদের সতর্ক হতে হবে। তা হল: আমরা এমন কিছু অভিযান পরিচালনা করি, যাতে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল করা হয় না যে, তা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে মুজাহিদদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করবে কি কিনা। এগুলো আমাদেরকে কিছু লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয় আর মূল টার্গেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যর্থ করে দেয়। সূক্ষ্ম বিচারের দাবি এটাই যে, প্রতিটি অভিযান পরিচালনার পূর্বে আমরা তার ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করব এবং চিন্তা করব যে, কোনটা অগ্রগণ্য বা প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত।

একারণে আমি এমন একটি বিবৃতি রিলিজ করতে চাই, যার মধ্যে আমি এই বিষয়ের আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। পূর্বে আমাদের থেকে তাড়াহুড়াবশত যা-কিছু হয়েছে, তার সংশোধনের জন্য। আর এর মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহর তাওফিকে উম্মাহর এমন বিরাট অংশের আস্থা ফিরিয়ে আনব, যারা মুজাহিদীনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর মুজাহিদীন ও উম্মাহর মাঝে যোগাযোগের পন্থাগুলোও বৃদ্ধি করবো ইনশা আল্লাহ'।

আমরা কি এই বীরত্বটুকুর অধিকারী হতে পারব, যা আমাদেরকে উম্মাহর অনুসরণীয় বানাবে এবং আমরা তাদের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করতে পারব?

আমাদের সর্বশেষ কথা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মদের উপর, তার পরিবাবর্গ ও সাহাবীদের উপর।

আপনাদের ভাই

আইমান আয-যাওয়াহিরী

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ পরিবারের বার্তা

“উম্মাতুন ওয়াহিদাহ”: মাধ্যম ও টার্গেট

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই। শাস্তি কেবল জালিমদের উপর। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, যিনি রাসুলদের সরদার ও মুত্তাকিদের ইমাম। সেইসাথে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

'হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং এই রাসুলের অনুসরণ করেছি। তাই, আপনি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে লিপিবদ্ধ করুন'। আমরা আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে, কাবাকে কেবলা হিসাবে, কোরআনকে আমাদের আদর্শ হিসাবে এবং আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসুল ও নবী হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

হে মুমিন ভাই ও বোনোরা, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমাদের একটি ব্যাধি রয়েছে। আর এটা আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যাধি যা আমাদের শত্রুদেরকে আমাদের প্রতি লালায়িত করেছে। এই ব্যাধির কারণে আমাদের দেশগুলোতে তাদের আগ্রাসনের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হয়েছে। আর এই ব্যাধিটা হল: তাওহিদের কালিমা থেকে আমাদের বিভক্তি, তাওহিদের পতাকা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতা এবং তাওহিদের বাহিনী থেকে আমাদের বিক্ষিপ্ততা।

একারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল: তাওহিদের কালিমার উপর সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার দাওয়াত দেওয়ার, সার্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের মাঝে বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলা। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে উম্মাহর নিকট উপদেশ ও বাণী পৌঁছাতে সামান্যতমও ত্রুটি করেননি। এটা কীভাবে হতে পারে, যখন স্বয়ং তাঁর রব তাঁর উপর নাযিল করেছেন: "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে যায়, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।'

একারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টার ভয় করতেন, তা হল: তাদের মাঝেও পূর্ববর্তী জাতিদের সেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে কি-না, যার ফলে তারাও পূর্ববর্তীদের মত মতবিরোধে লিপ্ত হয় এবং নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মানুষ দেখেছে, বিভিন্ন ইসলামী দলগুলো, বেতনভুক্ত সংগঠনগুলো এবং আরব জাতিগুলো কীভাবে উম্মাহর প্রতীকগুলোকে বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী দলের অধীনে ও ছায়াতলে নিয়ে গেছে। আর এর ফলে অধিকাংশ দলেরই প্রভাব দুর্বল হয়ে গেছে। এর কারণ হল, এ সকল সংগঠনের অনেক দায়িত্বশীলরা সংগঠনের ব্যাপারে মুখে এমন কথা বলত, যা তাদের অন্তরে নেই। দিনের শুরুতে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত আর শেষভাগে কুফর করত। মুসলিম জাতির সামনে অনেক কিছু বলত, কিন্তু যখন তাদের নেতাদের সাথে নির্জনে মিলিত হত, তখন বলত: আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা মুসলিমরে সাথে ঠাট্টা করি মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি যে, দেশ, ভাষা ও বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা মুসলিমরা এক জাতি। মহান রব বলেন,

'নিশ্চিত জেনো, এটাই তোমাদের দ্বীন, যার দাওয়াত সমস্ত নবী-রাসুল দিত। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর'। কোনো বিবেচক ব্যক্তি এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না যে, আমাদের এই এক জাতির মাঝে ঐক্য ও একতা শরীয়ভাবেও ফরজ এবং যৌক্তিভাবেও অত্যাবশ্যক। ধর্মীয় দিক থেকে, কোরআনের বর্ণনার আলোকে আমরা মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই এবং এক জাতি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বর্ণনার আলোকে আমরা এক দেহ। রাজনৈতিক দিক থেকে, আমাদেরকে যে বিপদ বেষ্টন করে আছে, তা দূর করা ও আমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য তাওহিদের কালিমার অধীনে এক হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সেই সাথে এক ইমাম ও এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

আমাদের চিন্তা-চেতনা জুড়ে আছে মুসলিমদের ঐক্যের চিন্তা। বিগত ত্রিশ বছরে আমাদের দাওয়াতী ও সামরিক প্রচেষ্টার বড় একটি অংশ জুড়ে আছে ঐক্যের চেষ্টা। এ দীর্ঘ সময় ধরে আমরা, আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব ও রাজনৈতিক বুঝ দ্বারা সকল বিবাদ ও বিচ্ছেদ দূর করার জন্য চেষ্টা করে আসছি। যদিও আমাদের নিজেদের অনেক গুনাহ ও ভুল-ভ্রান্তি আছে। কিন্তু আমরা অনবরত সকল প্রকার মতবিরোধের চোরাপথগুলো বন্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি।

একারণে আমরা মনে করি, যার প্রতি আমরা পূর্বেও আহবান করেছি এবং এখনও আহবান করি, তাতে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সকল লোকই এগিয়ে থাকবে, যারা আমাদের মত ও আমাদের ভাই। যারা দাওয়াত, জিহাদ, রাজনীতি সহ সকল ময়দানে ইসলামের জন্য কাজ করার ব্যাপারে সচেষ্ট। তাই আমরা তাদের দিকে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, ইসলামের পতাকা সুউচ্চ করার কাজে সাহায্য-সহযোগীতা করার জন্য। আমরা সকলে আশাবাদী যে, এই দ্বীনের বিজয়ের জন্য প্রচেষ্টাকারী সকল নিষ্ঠাবান ভাইদের থেকে আমরা আন্তরিক সাড়া ও সাহায্য পাব।

ক্রুসেডার জাতি-গোষ্ঠী ও ইসলামী সভ্যতা বিরোধী পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে চলমান লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের মন- মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করার একটি প্রতিযোগিতা চলছে। তাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের মাঝেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, সে সকল পবিত্র মস্তিষ্কসমূহে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে, হিম্মত জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে এবং সে সকল পবিত্র আত্মাসমূহে আত্মমর্যাদার বীজ বপন করার মাধ্যমে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মোকাবেলা করার।

এরফলে আমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ দান করলেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মহান জাতির মাঝে আমাদের উত্তম গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যের মুখপাত্র হিসেবে স্থান করে দিলেন। আমাদের মুসলিম ভাইদের মাঝে আমাদের সত্য অবস্থান এবং মিডিয়া ও সামরিক যুদ্ধে আন্তর্জাতিক কুফরের মোকাবেলার ক্ষেত্রে বন্ধু-শত্রু সকলের নিকট একটি মর্যাদা দান করলেন।
ফলে, আমাদের অক্ষয় জাতির শত শত হাজার হাজার যুবক-বৃদ্ধ আমাদের সাথে যোগ দিলেন। আল্লাহ তায়ালা যুগের চাহিদা ও সময়ের ফরজ হিসাবে তাদের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করেছেন, তা আদায় করলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও মিডিয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করলেন। তখন "তালায়িউ খুরাসান" নামের পত্রিকায় তাঁদের প্রবন্ধগুলো আসত, যা আফগানিস্তানের জিহাদ ও মুজাহিদগণের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করত।

তারপর, নব্য ক্রুসেড শুরুর ১০ বছর পর ভাগ্যের চাকা ঘুরতে ঘুরতে "তালায়িউ খুরাসান" এর সিংহভাগ সৈন্য আক্রান্ত হলেন। আল্লাহর নিকট দু'আ করি, আল্লাহ তাঁদের জিহাদকে কবুল করুন। আমাদেরকে তাঁদের সাথে কল্যাণের উপর মিলিত করুন। অতঃপর, পুনরায় ভাগ্যের চাকা ঘুরল। আমরা, আমাদের মিডিয়া শাখার জন্য নতুন নামে নতুন করে জেগে উঠলাম। নতুন করে পথচলা শুরু করলাম। যার নাম হল: 'উম্মাতুন ওয়াহিদাহ'। ধারাবাহিক যুদ্ধ ও উত্তপ্ত রক্তপাতের মাঝে, আমাদের পত্রিকা বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে গন্তব্যপানে এগিয়ে যেতে পারবে কি-না, আমরা জানি না। কিন্তু আমরা আমাদের মহান জাতির সাথে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা তাঁদের সুখে-দুখে, সচ্ছলতা ও সংকটে তাঁদের মুখপাত্র হয়ে তাঁদের সাথে থাকব ইনশা আল্লাহ।

বর্তমানে আমরা লড়াইয়ের এক নতুন ধাপে আছি। সময়ের চাহিদা হল - সমগ্র বিশ্বে ইসলামের জন্য প্রচেষ্টকারী লোকদের মাঝে ঐক্য ও একতার চেতনা সৃষ্টি করা। এই ঐক্যের চেতনা নিয়ে সমস্ত ইসলামী শক্তিগুলোকে একত্রিত করা ও নয়া যামানার ইসলামী মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। যার ক্ষেত্র ও শাখা-প্রশাখা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, যদি মুসলিমগণ এক জাতি হয়ে যেত, যেমনটা আমাদের রব চান, তাহলে কখনো আজ ফিলিস্তিন ও হারামাইন বরবাদ হয়ে যেত না। কখনোই ইসলামী ভূখন্ডগুলোর উপর এই ক্রমাগত আঘাত আসত না।

উম্মাতুন ওয়াহিদাহ' ম্যাগাজিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

'উম্মাতুন ওয়াহিদাহ' পত্রিকা হল আল-কায়েদার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা শাণিত করার আন্দোলনের একটি অংশ। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আমাদের চূড়ান্ত আশা হল, ইসলামের জন্য প্রচেষ্টকারী সকল ভাইদেরকে নিয়ে জাতিকে জিহাদের পথে পরিচালিত করা। তাঁদের চিন্তা-চেতনার উন্নতি ঘটানো এবং তাঁদের রাজনৈতিক বুঝকে পরিপক্ক করা।

১) আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল, সকল মানুষকে আল্লাহর সেই পথে আহবান করা, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে মনোনীত করেছেন। যেন সমস্ত মানবজাতি হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে ইসলামের নূরের দিকে ও শান্তির পথে পরিচালিত হন।

২) আমরা ইসলামের মহত্ত্ব ও মৌলিকত্বের সাথে, শরীয়তের বড়ত্ব ও বাস্তবতার সাথে এবং ইসলামের মহান উদ্দেশ্য ও উন্নত আদর্শের সাথে ঈমানের প্রচার ঘটনোর চেষ্টা করি। শুধুমাত্র মুসলিমদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য নয়; বরং সমস্ত মানবজাতির সমস্যা সমাধানের জন্য। আর আমরা শরীয়ত ব্যতীত যত মানবরচিত কুফরী বিধান আছে, যেমন শিরকী গণতন্ত্র ও কুফরী সংবিধান- এগুলোকে ছুড়ে ফেলি।

৩) আমরা মনে করি, আমাদের উপর সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি, এ যুগের সবচেয়ে বড় চাহিদা এবং মুসলিম জাতিকে ইহুদীবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত মাধ্যম হল, যুগের হুবাল আমেরিকা ও তার মিত্রদের সাথে যুদ্ধের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা। আমেরিকা অব্যাহতভাবে ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে, মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোকে অসম্মান করছে, তাদের সম্পদসমূহ ছিনতাই করছে এবং মুসলিম দেশের মুরতাদদেরকে সাহায্য করছে। আমরা মনে করি, আমাদের বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য দানকারী ইবাদত হল, আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৪) আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, আমাদের মহান জাতি, মুসলিম জাতির সাথে যুক্ত থাকতে এবং তাদের একজনকে আরেকজনের সঙ্গে যুক্ত করতে। সেই সঙ্গে আসন্ন বিপদ মোকাবেলা ও চলমান আঘাত প্রতিহত করার আদর্শ পদ্ধতি বর্ণনা করার মাধ্যমে উম্মাহর কল্যাণ কামনা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের এক জাতিকে সংকীর্ণ গোত্র ও ভূখণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করার কারণেই আমাদের জাতির অন্তর থেকে আত্মমর্যাদা ও ইসলামী শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি, এভাবে তাদেরকে মানসিকভাবে হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলা হলেও সেটা অত্যুক্তি হবে না।

৫) সাইকস-পিকট চুক্তির মাধ্যমে একক ইসলামী বিশ্বকে বিভক্ত করাকে আমরা রুটিকে টুকরো টুকরো করার মত মনে করি, যাকে চাবানোর সুবিধার জন্য এবং এক লোকমা এক লোকমা করে গ্রাস করার জন্য ভাগ করা হয়েছে।

৬) আমরা চেষ্টা করি, আমাদের কোরআন তিলাওয়াতকারীদের মাঝে কোরআনের নূর ও সহীহ সুন্নাহর আলো প্রচার করতে, যেন তাঁদের আত্মাকে ঈমান ও ইয়াকীনের খোরাক দেওয়া যায়, তাঁদের নিয়্যতকে উঁচু হিম্মত ও আন্তরিক সংকল্পের মাধ্যমে উন্নত করা যায়। তাঁদের আমলকে উত্তম আখলাকের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করা যায় এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দেওয়া যায়।

৭) আমরা মুমিনদেরকে উৎসাহিত করি, সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আমরা সত্যবাদী অন্তরসমূহে ঈমানী সহানুভূতি প্রজ্জলিত করার চেষ্টা করি। সশস্ত্র ইসলামী আন্দোলনগুলোকে পথপ্রদর্শন, জিহাদী ধারার সংশোধন, আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের চিন্তা-চেতনার তত্ত্বাবধান এবং সময়ের চাহিদা ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণও আমাদের লক্ষ্য।

৮) আমাদের একটি লক্ষ্য হল মুসলিম জাতিকে তার কর্তব্যের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেওয়া এবং আমাদের মহান জাতির সামনে তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ স্পষ্ট করা। শত্রুর প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করা এবং তাদের মোকাবেলার পদ্ধতি পরিষ্কার করা।

৯) আমরা আমাদের মহান জাতির সামনে নিজেদেরকে ব্যাখ্যা করতে চাই। তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে লুকায়িত ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার কথা প্রকাশ করতে চাই। আমরা নিজেরাও তাদের একটি অংশ এবং তাদের সম্মানের জন্যই আমরা যুদ্ধ করছি। আমরা এই কাজটা এইজন্য করতে চাই - যারা আমাদের ব্যাপারে অজ্ঞ বা যাদেরকে আমাদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিভ্রান্ত করা হয়েছে, তারা আমাদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পান।

১০) আমাদের আরেকটি লক্ষ্য - আমাদের বার্তা উম্মাহর কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমরা আমাদের ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে মর্যাদা দিতে চাই এবং প্রত্যেক ময়দানে ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টাকারী সকল ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে চাই। বিশেষ করে জিহাদী, ইলমী, দাওয়াতী ও শরয়ী রাজনীতির ময়দানে কর্মরত ভাইদের সঙ্গে। যাতে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঐক্য ও একতা বাস্তবায়ন করতে পারি অথবা পারস্পরিক যোগাযোগ, বোঝাপড়া ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে ন্যূনতম এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারি, যার মাধ্যমে আমাদের মহান জাতির ইহ-পরকালীন সামগ্রিক কল্যাণ অর্জিত হয়।

১১) আমরা মুসলিমদের প্রতি সুধারণার প্রসার ঘটাতে আগ্রহী। বিশেষ করে, যারা আমাদের মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইলম, দাওয়াত, সততা, নিষ্ঠা ইত্যাদিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের ব্যাপারে। আর আমরা দ্বীনের যেকোন কর্মীর সমালোচনা বা তাঁর প্রতি ঘৃণার অবস্থা দূর করতে আগ্রহী। যেন ইসলামের কর্মীদের থেকে সকল নিন্দা দূর হয়ে যায়, যদিও আমরা বিভিন্ন সমস্যা নির্ণয় ও তার সমাধানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন মত পোষণ করি।

১২) আমরা যখন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হই, তখন নিজেদের ঘাড়ে কালিমার আমানত ও কলমের পবিত্রতার ভার বহন করি। আমাদের মহান জাতিকে হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে উপদেশ দেই। যেন স্বাধীন হওয়া ও স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে তাঁদের মহান পথচলা সফলতা লাভ করে। আমরা সকলেই আমাদের জাতিকে অকল্যাণের পথ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি।

১৩) আমরা, আমাদের ইসলামী মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সামগ্রিক আন্দোলনে এবং উম্মাহকে নতুন করে বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাগ্রত করার পথে যেটাকে হক বলে বিশ্বাস করি, তা স্পষ্টভাবে বলে দেই। আর যেকোন কল্যাণকামী ও সংশোধনকারীর উপদেশ ও সংশোধন গ্রহণ করি।

১৪) দুই হারামাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করা - আমাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যমণি। প্রতিটি দখলকৃত দেশ, আমাদের হৃদপিণ্ডের একেকটি অংশ এবং বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এক একটি শাখা। একারণে আমরা এগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে চাই।

১৫) আমরা আহলুল ইলম ও মুজাহিদগণকে উপদেশ দেই, তাঁরা যেন নিজেদের মাঝে সমঝোতা ও ক্ষমার ব্যাপারে সকলের অনুকরণীয় হন। এছাড়া, উত্তম ব্যবহার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি যত্নবান হন। নতুন প্রজন্মকে দিক-নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন। বড়দেরকে সম্মান করার, ছোটদেরকে স্নেহ করার, উত্তম চরিত্র গঠন করার এবং ঝগড়া, অনর্থক কথা ও অশ্লীল কথা বর্জন করার শিক্ষা দেন।

১৬) আমাদের একটি লক্ষ্য হল ইসলামী দাওয়াতী, জিহাদী ও রাজনৈতিক কাজের উন্নতি করা। যেন এর মাধ্যমে বহিরাগত ইহুদীবাদী দখলদারদের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাদের এজেন্ট স্বদেশী মুরতাদদের সীমালঙ্ঘন থেকে রক্ষা লাভের জন্য উম্মত যে বিক্ষিপ্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো করছে, তাকে এক করা যায়।

লেখালেখি ও মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

১৭) আমাদের লক্ষ্য হল - ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি উম্মাহর সন্তানদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাঁদেরকে একথা জানানো যে, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি প্রত্যেকের উপর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। কেননা আজকের যুদ্ধ প্রত্যেকেরই নিজ দেশ, নিজ সীমান্ত ও নিজ দূর্গ রক্ষার যুদ্ধ। এজন্য আমরা উম্মাহকে আহবান করছি, নিজেদের সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ করার। যাকাতের অর্থ নিজেদের সেসকল ভাইদেরকে দেওয়ার আহবান করছি, যারা জিহাদ ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছেন। আমরা উম্মাহর সদস্যের আরও আহবান জানাই তাঁরা যেন হিজরত ও জিহাদের কাফেলায় যুক্ত হন।

১৮) জিহাদ, দাওয়াত ও শরয়ী রাজনীতির ময়দানে নামার ব্যাপারে যারা প্রকাশ্য অলসতা করে, আমরা তাদের উপর আপত্তি করি। আমরা মনে করি, আমরা যাদের উপর আপত্তি করি, তাদেরকে যে বিষয়টিতে সবচেয়ে কঠিনভাবে ধরা হবে, তা হল, ইসলামের সৈন্য হওয়া থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করা। অথচ এটা হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য।

তারা কি জানে না যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের পরবর্তী পুণ্যবান শাসকগণ কোনো আলেম বা তালিবুল ইলমকে জিহাদ বা বিজয় অভিযানে প্রেরণ করা থেকে অব্যাহতি দেননি? সে সময় কোনো আলেম তো দূরের কথা, কোনো মুসলিমও অব্যাহতি চাইত না বা এর জন্য ওযর পেশ করত না। এমনকি কারো নিকট এই প্রস্তাব পেশ করা হলেও রাজি হত না। বরং তাঁরা স্বভাবতই জিহাদী রণাঙ্গনগুলোতে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগীতা করতেন। আহলে ইলমগণ সর্বদা সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে থাকতেন। পেছনে থাকতেন না। তাঁরা জিহাদে বের হওয়া থেকে কোনো ওযর পেশ করাকে মুনাফিকীর আলামত হিসাবে বিবেচনা করতেন।

১৯) আমরা ভালবাসা, দয়া ও স্নেহের সাথে – নিজেদেরকে, সমস্ত মুসলিম জাতিকে, বিশেষ করে আলেম ও চিন্তাশীলদেরকে উপদেশ দিচ্ছি - তাঁরা যেন আমাদের উম্মাহর এই মহা দুর্যোগকে ছোট মন-মানসিকতা ও তুচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখেন। ইসলামকে ভাগ ভাগ আকারে না দেখেন। ইসলামের সামগ্রিক বিষয়কে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দের অধীন না করে ফেলেন।

২০) ইসলামের বিজয়ের জন্য জেগে উঠা সকল ভাইদেরকে বলতে চাই - আমরা বুঝি যে, আমাদের জাতির সমস্যাগুলো কোনো একটি দল, একটি ইসলামী দেশ বা একজন আলেম ও ফকীহের একক প্রচেষ্টা ও গবেষণার মাধ্যমে সমাধান হবে না।

উম্মাহ যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমরা তা অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি এবং তা আল্লাহর দ্বীনের অংশ মনে করি যে - আমাদের উম্মাহর সংকট ও সমকালীন দুর্যোগের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণার জন্য অবশ্যই আলেম, ফকীহ, সঠিক চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোকদের একটি ঐক্য গড়তে হবে। দ্বীন, জীবন ও ভূমি রক্ষার জন্য সকলকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে, যেন সত্যিকরার্থেই একটি একক জিহাদী জাতি গড়ে উঠতে পারে, যারা তাওহিদের কালিমার অধীনে জিহাদ করবে। বিগত বিশ বছর যাবত "ঐক্যের প্রেরক ও বিবাদের উৎসের মাঝে ইসলামী কার্যক্রম" নামক বার্তায় এর প্রতিই আমরা সকল মুসলিমকে আহবান করছি এবং মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণ ও বিবৃতিগুলোতে প্রতিবার এই বার্তা নতুনভাবে দিচ্ছেন। যার ধারবাহিকতায় সর্বশেষ বিবৃতিটির শিরোনাম হল: "ইসলামের সমর্থনে একটি প্রামাণ্যপত্র"।

আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন, যাদের কথা ও কাজ সুন্দর। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন। (আমীন)

তাদের জন্য কোনো অভিনন্দন নেই!

[শায়খুল আযহার, ক্যাথলিক পোপ, অর্থোডক্স আম্পা,
ইবনে সালমান ও ইবনে যায়েদ; জাহান্নামের গেইটের আহ্বানকারীর দল!]

সালিম আশ-শরীফ

AL HIKMAH MEDIA

১. শ্রদ্ধার স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে ফেলা, সীমালঙ্ঘন করা, আহলে ইলমদের ব্যাপারে অসৌজন্যমূলক কথা বলা, তাঁদেরকে কারারুদ্ধ করা, ফাঁসির ইঙ্গিত দেওয়া, যা গোপন রাখার বিষয় তা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করে গর্ববোধ করা, অশ্লীলতা ও প্রকাশ্য পাপাচার ছড়ানো ইসলামের তীর্থভূমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিতে ইসলামের বিরুদ্ধে পরিষ্কার যুদ্ধ- আর এসবই ইহুদী-খৃষ্টানদের দুই বড় কর্মচারি ইবনে সালমান ও ইবনে যায়েদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

এটা ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের ধারাবাহিক হামলাসমূহের মধ্যে একটি হামলা। ইসলামের রক্তক্ষরণ করা হচ্ছে,তার পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো কোনো নেতৃত্ব নেই। কোনো দূর্গ বা ঘাঁটিও নেই। যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে ভেতর থেকেই। ওই সকল শাসকশ্রেণীর মাধ্যমে, যাদেরকে বৃটেন ও আমেরিকার সহযোগীতায় ইহুদীরা ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমাদের নিকট বার্তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যার কিছুটা ইঙ্গিত বহন করে সম্প্রতি ক্যাথলিক পোপ ও অর্থোডক্স আম্পা'র হারামাইনের দেশ ভ্রমণের ঘটনা। তাই ক্রুসেডারদের সামরিক হামলা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কূটনৈতিক হামলা বন্ধ হয়নি, আর তা কখনো বন্ধ হবেও না।

২. একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম উম্মাহর গুটিকয়েক ঈমানদার যুবক আমেরিকার হৃদপিণ্ডে গিয়ে হামলা করেছিল। এটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী একটি পাল্টা গেরিলা হামলা। এ গেরিলা হামলার উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসের চলমান ধাপে সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পতাকা বহনকারী আমেরিকার প্রভাব শেষ করে দেওয়া। আর অচিরেই আমেরিকা তার পূর্ববর্তীদের সাথে যুক্ত হবে। যারা বাতিলের প্রসার ঘটাতে এবং হককে দাফন করতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহ তায়ালার নীতি। এই মোবারক হামলার ফল এই হল যে, বিশ্বের আত্মমর্যাদাশীল লোকগুলো আমেরিকার বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠল। এমনকি এক যুবক তো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উপর জুতা নিক্ষেপ করল। এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, বিশ্বব্যাপী আমেরিকার কর্তৃত্ব চর্চার সাম্রাজ্যবাদী নীতি মুখ থুবড়ে পড়ল। একটি আন্তর্জাতিক নীতির পতন ঘটে আরেকটি আন্তর্জাতিক নীতির অভ্যুদয় হল, যে আন্তর্জাতিক নীতিতে মুসলিমদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. জনগণের অনুভূতি নিয়ে খেলা হল শাসকশ্রেণীর নিজেদের ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও নীতি চালু করার জন্য বহুল প্রচলিত একটি কৌশল। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক প্রলম্বিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক পিলে চমকানো তথ্য বেরিয়ে এসেছে। ইহুদী গোষ্ঠী, সৌদ পরিবার ও যায়েদ পরিবার সম্মিলিতভাবে ওই সকল বিপ্লবগুলোকে মাটিতে দাফন করার ঘোষণা দিল, যেগুলো শত্রুদের এজেন্টদের বিরুদ্ধে এবং তাদের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের মাঝে গড়ে উঠেছিল।

প্রকৃতপক্ষে, রিয়াদের যুবরাজ বিন সালমানের উপর কতগুলো দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। আর তার বক্তব্য একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সে এই দায়িত্ব গ্রহণও করে নিয়েছে। এবং সে তা কার্যকর করার জন্য সর্বসাধ্য চেষ্টা করবে। তার কাঁধেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, পবিত্র ভূখণ্ডে অশ্লীলতা প্রসার করার এবং ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানহানি করার।

৪. বিন সালমান ও ইবনে যায়েদ হারামাইনের দেশে খৃষ্টীয় নৈশভোজের অনুমতি প্রদান ক্রেছে। আর এটি হল ইসলামের জন্মভূমিতে খৃষ্টধর্মের প্রতি আহ্বান, খৃষ্টবাদকে বৈধতা প্রদান এবং তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার এক অহংকারী প্রতিযোগিতা। এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম ও বিশ্বের অন্যান্য কাফেরদেরকে খৃষ্টবাদে প্রবেশ করার প্রতি উৎসাহ দান এবং খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে প্রবেশে বাঁধা প্রদানের একটি অংশ। সেও তার পূর্বসূরীদের ন্যায় ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং যেকোনো ঈমানদার মানুষকে শেষ করে দেওয়ার যুদ্ধে প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্ব কুফরী শক্তি অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছে। এখন তারা মুহাম্মদ ﷺ এর ভূমিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক যাত্রা করতে আগ্রহী।

৫. কোনো ধরণের বিনয়-নম্রতা ব্যতিত কা'বার ছাদে আরোহন করা ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য নষ্ট করার পদক্ষেপ ব্যতিত কিছুই নয়। এ তো সেই নির্বোধ, যে ইতর ও পাপিষ্ঠদেরকে আপ্যায়ন করেছে, তাদের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দিয়েছে। সর্বপ্রকার নির্লজ্জতার সাথে পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্রতম প্রতীকের উপর বসেছে উঁচু আসনে বসে সরাসরি কাজ-কর্ম পরিদর্শন করার অজুহতে।

হে নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ বিন সালমান! কা'বা হল ইবাদতের জন্য। এটা কাজ পরিদর্শনের উঁচু আসন নয়। তাই তুমি যদি তোমার কাজের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চাও যে: "তোমাদের কেবলা আমার পায়ের নীচে", তাহলে তুমি তোমার কাজের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করো !

হে আল্লাহ! এই ঘরের মর্যাদা, সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য আরো বৃদ্ধি করে দিন। হে আল্লাহ! যে তার অসম্মান করেছে বা তার মর্যাদা খাটো করেছে, আপনি তাকে অসম্মানিত করুন।

৬. জনগণের অনুভূতি নিয়ে খেলার আরেকটি বিষয় হল: পতনোন্মুখ গর্তের কিনারায় কুফরের ভীত নির্মাণের জন্য অতীত ও বর্তমানের ব্যাপারে মিথ্যাচার করা। নানা বিকৃত কল্প-কাহিনীর উৎস ও সীমালঙ্ঘনের কেন্দ্রবিন্দু গীর্জা কোনো দিনও শান্তির বার্তা বহনকারী ছিল না। কখনোই তা মানবতার জন্য আলোকবর্তিকা ছিল না। আর এই সীমালঙ্ঘনে তাদের সাথে অংশীদার ছিল বৌদ্ধগোষ্ঠীর ধর্মীয় নেতা ও তার অনুসারীরাও। যদি এমনটাই হয়, তাহলে সারা বিশ্বব্যাপী মানবসভ্যতার সাথে যে লাইসেন্সকৃত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে কি কোনো মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল না? সেখানে কি ভালবাসার ধর্ম ছিল না? আসলে, এটা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত কারণে যে সকল হত্যা ও উচ্ছেদ হয়েছে, তখন কোথায় ছিল পূর্ব-পশ্চিমের পোপরা? কোথায় ছিল দালায়লামা? আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, মায়ানমার, পূর্ব তুর্কিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, বসনিয়া, পূর্ব তিমুর, ভারত, লিবিয়া, মালি, সিরিয়া ইত্যাদি দেশে গনহত্যা তারা কি দেখছে না ? এ সকল যুদ্ধের টার্গেট একটাই। তা হল, ইসলাম ও সর্বাস্থানের মুসলিমগণ।

ইবনে যায়েদ যখন লিবিয়ান বিপ্লবী ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে হাফতারকে সমর্থন করছিল, অর্থায়ন করছিল এবং মালির মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধে সহযোগীতার জন্য তাদের সেনাবাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করছিল, তখন কোথায় ছিল মানবাধিকার? ইবনে যায়েদ ও তার নিকৃষ্ট সঙ্গী ইবনে সালমান ইয়েমেনের ভূখণ্ড ও তার জনগণের সাথে যা করেছে, তখন তাদের মানবাধিকার কোথায় গিয়েছিল? যুদ্ধ, রোগ- ব্যাধি ও ক্ষুধার মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিগত শতাব্দীর দীর্ঘসময় ধরে তাদেরকে যে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, তা কি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়নি?

আসলে এ সবকিছুই আদনে আবইয়ান থেকে ১২ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট বাহিনীর আবির্ভাব ঠেকানোর জন্য। তবে তারা অচিরেই বের হবে ইনশা আল্লাহ। সুনির্দিষ্ট সময়ে তোমাদেরকে তোমাদের শাসন থেকে অবশ্যই অপসারণ করা হবে। আমাদের মনে এব্যাপারে একচুলও সন্দেহ নেই।

৭. ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উত্তপ্ত প্রতিযোগীতা চলছে। আসলে এগুলো বিভিন্ন ধাপ পূর্ণ করার অংশ। রিয়াদ অর্থোডক্স আম্পাকে আপ্যায়ন করে। আবুধাবি ক্যাথলিককে আপ্যায়ন করে। আর উপসাগরীয় অন্য রাষ্ট্রগুলো গীর্জার সমাবেশ ঘটায়। কাতারের দোহায় উপসাগরীয় অঞ্চলগুলোর সর্ববৃহৎ গীর্জা বিদ্যমান। জাযীরাতুল আরবের আকাশে ৩০ এরও অধিক গীর্জার ঘন্টা ধ্বনি বাজে। আর শায়খুল আযহারের উপস্থিতি আসন্ন আগমনকে স্বাগতম জানানো এবং ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে দর কষাকষির ইঙ্গিত বহন করে। তারা একটি লক্ষ্যের দিকেই দ্রুত পদক্ষেপে আগাচ্ছে। তা হল একটি নতুন ধর্ম। যার পতাকাতলে সকল ধর্মের বিশ্বাসগুলো একত্রিত হয়ে যাবে। সব ধর্মের সাথে আপোস করাই হল তাদের কথিত ভালবাসার ধর্ম। যেটা হল মানসুর হাল্লাজের ধর্ম। লালনশাহর ধর্ম। মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ও তার শীষ্য জালালুদ্দীন রূমীর ধর্ম।

তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জনগণের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলা করার মাধ্যমে এটা বাস্তবায়ন করতে চায়। আর প্রত্যেককেই যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে সেটা স্বতস্ফুর্তভাবে পালন করছে।

আজ গীর্জার প্রধানদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে তো, আগামীকাল দালায়লামা ও মন্দিরের প্রধানদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তারপর ইহুদী ধর্মগুরুদেরকে আমন্ত্রণ জানানো তো একেবারে সহজ। আর ইহুদী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো তো এমন বিষয় হয়ে গেছে, যা উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি রাষ্ট্রই প্রকাশ্যে বা গোপনে করছে।

৮. জনগণের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলা করার জন্য তাদের আরেকটি পদ্ধতি হল, বিভিন্ন প্রকার শারীরিক কসরত আমদানি করার মাধ্যমে জনগণকে উদাসীন করে ফেলা। যেমন ফুটবল প্রতিযোগীতাকে জিহাদ ও বিজয়াভিযানের বিকল্প হিসাবে কাজে লাগানো। ফুটবলকে, মুসলিম উম্মাহর উপর ক্রুসেডার-ইহুদী-হিন্দু-বৌদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ধারাবাহিক নির্যাতন, আঘাত ও হামলার শিকার হওয়ার কারণে উম্মাহর হৃদয়ে যে ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহা জেগে উঠে, তা থেকে অন্তরকে পরিস্কার করার মাধ্যম বানানো।
আরেকটি পদ্ধতি হল, বিনোদনের নামে যিনা ও পাপাচারের আড্ডাখানা নির্মাণ করা এবং নাইটক্লাব প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তির দরজা খুলে দেওয়া!!

প্রশ্ন হল, এ সকল নাইটক্লাবগুলো কি কখনো বৈধ নৈশালাপের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকেছে, নাকি এগুলো প্রকাশ্য নাফরমানীর ব্যবস্থা, যাকে সরকারী শক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে? বাহরাইন কি উপসাগরীয় দেশসমূহের এমন বেশ্যালয়ে পরিণত হয়নি, যার একার নাফরমানী ও আল্লাহ-বিরোধী কর্মকাণ্ড-ই গোটা আরব অঞ্চলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট? কুয়েত কি তার স্বাধীনতার আগে ও পরে পশ্চিমায়ন ও পশ্চিমা সভ্যতা প্রচার-প্রসারের বড় বড় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেনি? তাদের প্রত্যেকটি দেশেই কি আমেরিকা ও বৃটেনের সামরিক ঘাটিসমূহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই? যেন প্রথমত: ক্রুসেডাররা অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক স্বার্থগুলো রক্ষা করতে পারে। এবং তারপর তাদের পোষ্য শাসকশ্রেণীকে আরব জনগণ থেকে রক্ষা করতে পারে?

বর্তমানে উপসাগরীয় অঞ্চলের সিংহভাগ শাসক এবং তাদের পূর্বসূরীরাই কি ক্রুশের প্রতীক বহন করছে না? আমেরিকান বাহিনী তালেবানদের হাতে মার খেয়ে এবং কাবুলের ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে চলে যাবার পর কাবুলের শাসকের যে পরিণতি হবে, আরবের এ সকল শাসকদের ভবিষ্যৎ পরিণতিও হুবহু তাই হবে। বরং জাযীরাতুল আরবের ভিতরে-বাইরে মুসলিমদের সাথে অতি নিকৃষ্ট আচরণের কারণে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে।

৯. কতিপয় আহলে ইলম এখনও মুসলিম দেশগুলোর শাসকশ্রেণী এবং খৃষ্টানদের বড় বড় নেতা ও শাসকদের বক্তব্যসমূহের উপর আস্থা রাখে। তারা এর দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে এবং এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছে। অথচ এ সকল শাসকরা হল শত্রুর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির একেকজন সক্রিয় সদস্য। কারণ শত্রুরা অতি উচ্চস্তরের ধোঁকাবাজ। আর কূট-কৌশলের ময়দান যুদ্ধের ময়দানের চেয়েও ব্যাপক। তারা মানবাধিকারের কথা শোনায় একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরীর জন্য। মিথ্যা আশ্বাস দেয়ার জন্য। নমনীয়তা ও সমঝোতার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য এবং সকলকে সমান করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এই আগ্রহের কোনো লাগাম নেই। বরং তারা পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে, উম্মাহকে তাদের দ্বীন ও আত্মরক্ষা থেকে মুক্ত করার জন্য।

শক্তিশালী শত্রুর সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ সমাধানের আলোচনা ধ্বংস ছাড়া কিছুই নিয়ে আসে না। কোনো জ্ঞানীই বিশ্বাস করবে না যে, ক্রুসেডাররা তাদের মেনে নেওয়া শর্তগুলো পূরণ করবে এবং সন্ধিকৃত সীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করবে না। আসলে শক্তিশালীরা কোনো লাল রেখা চিনে না। তারা কোনো বিকল্প গ্রহণ করে না। তারা অচিরেই তাদের কোমলতার শক্তি দিয়ে অথবা প্রয়োজনের সময় কঠোরতার শক্তি দিয়ে তোমাদের দরজায় প্রবেশ করবেই এবং তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করবেই। পরিশেষে তোমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যতিত কিছুই গ্রহণ করবে না। তখন সেই জায়নবাদী ও ক্রুসেড হামলার মুখে ইসলাম ব্যতিত কিছুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। একারণেই সারা বিশ্বের কুফর ও নাস্তিক্যবাদের সকল শাখাগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

«يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْقَوْمُ إِلَى قَصْعَتِهِمْ» قَالَ: قِيلَ: مِنْ قِلَّةٍ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنَّهُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهَنُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَيَنْزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ لِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ الْمَوْتَ»

"শীঘ্রই এমন হবে যে, সমস্ত জাতিগোষ্ঠী একে অপরকে তোমাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করবে, যেমনিভাবে আহারকারীরা একে অপরকে খাবার পাত্রের দিকে আহ্বান করতে থাকে। বলা হল: এমনটা কি সেসময় আমাদের সংখ্যা স্বল্পতার কারণে হবে? তিনি বললেন: 'না, বরং তোমরা তখন অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা স্রোতে ভেসে যাওয়া লতাগুল্মের ন্যায় হবে। শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেওয়া হবে। সাহাবীরা (রা.) বললেন: ওয়াহন কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুর ভয় ।"

১০. প্রতিটি জাতিরই একটি সীমানা আছে এবং তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি নিরাপত্তাবলয় আছে। তেমনিভাবে বাইতুল্লাহরও একটি সীমানা ও নিরাপত্তাবলয় আছে। আল্লাহর ঘরের সীমানা ও নিরাপত্তাবলয় হল জাযীরাতুল আরব। তাই, সেখানে দুই ধর্ম একত্রিত হতে পারে না। জাযীরাতুল আরব, উত্তরে ইরাকের পল্লী এলাকা ও শামের মরু অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত। অপরদিকে পূর্বে পারস্য ও ওমান উপসাগর থেকে শুরু করে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত।

যে দেশ জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়, সেখানে গীর্জা বানানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আহলে ইলম একমত। তাহলে, রাসূলুল্লাল্লাহ ﷺ এর দেশের ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? সেখানে কোনো কুফরের কর্মীকে আমন্ত্রণ করা নিষেধ। সেখানে কোনো গীর্জা মন্দির বানানো নিষেধ। কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলোর শাসকরা শুধু কুফরের কর্মীদেরকে আমন্ত্রণ করে এবং মুসলিমদের ভূমি তাদেরকে প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা নিজেরাই মুসলিমদের সম্পদ দিয়ে গীর্জা ও মন্দির বানিয়ে দিচ্ছে। যায়েদ পরিবার তাদের আকিদা অনুযায়ী এবং তাদের নবী ইবনুল আরবীর অনুসরণ করত: গত বছরের শুরুর দিকে আবুধাবিতে হিন্দুদের জন্য মন্দির করে দিয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে ভ্যাটিকান সিটির পোপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং মুসলিমদের ভূমিতে তাকে নৈশভোজ পার্টি করার সুযোগ দিয়েছে।

আহলে ইলমদের নিকট প্রশ্ন: যে হিন্দু ও খৃষ্টানদেরকে মন্দির ও গীর্জা বানাতে জমি হাদিয়া প্রদান করে, তার হুকুম কী? অথবা যে মুসলিমদের দেশে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভূমিতে নিজে গীর্জা, মন্দির বানায় বা এতে অংশগ্রহণ করে, তার হুকুম কী? আর যে এমনটা করে, তার ক্ষেত্রে কর্তব্য কী? বাইতুল্লাহর নিরাপত্তাবলয়ের আরেকটি সীমা হল লোহিত সাগর। তাই, আজ মুসলিম শাসকদের কর্তব্য ছিল শত্রুদের জাহাজগুলো সেখান দিয়ে পারাপার হতে বাঁধা দেওয়া। যেন তার দুই তীরের মাঝে মুসলিমদের জাহাজগুলো ব্যতিত অন্য কোনো জাহাজ আসা-যাওয়া করতে না পারে বাইতুল্লাহর সংরক্ষণের জন্য এবং তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। যেন কাফেরদের জাহাজগুলো উপকূলের নিকটবর্তী হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করে ফেলতে না পারে।

কিন্তু আজ মুসলিমদের শাসক কারা? আর কিভাবে তারা মুসলিমদের উপর চেপে বসেছে? কারা তাদেরকে সাহায্য করছে ও তাদের পরিকল্পনা তৈরী করে দিচ্ছে? আর তাদেরকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে 'স্যান্ডহার্স্ট' এর মত সামরিক একাডেমিগুলোর ভূমিকা কী? এ প্রশ্নগুলো প্রতিটি মুসলিমের করা উচিত। এগুলো নিয়ে সুক্ষ্মভাবে চিন্তা উচিত এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী একনিষ্ঠ আহলে ইলমদের নিকট উত্তর জিজ্ঞেস করা উচিত। সরকারি উলামা সংগঠনের নিকট নয়।

১১. জর্দানের বাদশা প্যারিসের একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। আর এই মিছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ কটুক্তিকারীদের সমর্থনে এবং তাদের উপর হামলকারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল! মুসলিম দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠীর অধঃপতনের পরিমাণ এবং শয়তান তাদের কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা উপলব্ধি করার জন্য আমরা এই মিছিলের দৃশ্যটি দেখতে পারি।

এটা এমন একটি দৃশ্য, যেখানে রামাল্লার শাসক ও ইহুদী শাসক এক কাতারে কাতারবদ্ধ হয়েছে। শরীফ ও সায়ীদ নামক দুই বীর মুজাহিদ আল্লাহর দ্বীনের নিরাপত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ইসলামের সর্ববৃহৎ সম্মানের প্রতীকের অবমাননা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁরা উক্ত পত্রিকা(চার্লি হেব্দো) ও যে দেশ (ফ্রান্স) থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তাদেরকে শাস্তি দিলেন। আর এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, পশ্চিমা বিশ্ব কেন এই দুই বাহাদুরের অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় একটি অভূতপূর্ব মিছিলে তাদের ৫০ জন নেতা ও দায়িত্বশীল এবং প্রায় ৩৭ লক্ষ জনগণকে একত্রিত করেছিল? এই কাতারে শরিক হওয়া একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, উক্ত পত্রিকা যা করেছে, তারা তাকে সমর্থন করে এবং এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের অবস্থানেরও সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়।

তাই, কেউ যেন তাদের মধুময় কথা দ্বারা প্রতারিত না হয়। কেউ যেন তাদের প্রতি ভাল ধারণা না রাখে। আর তাদেরকে বলছি, তারাও যেন উম্মাহর সন্তানদের পাল্টা আঘাতের অপেক্ষায় থাকে। এমনিভাবে, যাদের মন তাদেরকে ইসলামের সীমাসমূহ লঙ্ঘন করতে ফুসলায়, তাদেরকেও বলছি, তারা যেন নিজেদের গর্দানগুলোর খোঁজ-খবর রাখে আর নিজেদের কাজের পরিণতির অপেক্ষায় থাকে।

পরিশেষে, মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতের মুজাহিদ সন্তানদের পক্ষ থেকে (আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য ও শাক্তিশালী করুন!)-ইবনে সালমান ও ইবনে যায়েদের প্রতি! (আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত ও অপমানিত করুন!)

তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বিগত সত্তর দশকে তোমরা তোমাদের মনিব আমেরিকার আনুগত্য করেছ। এখনও তাদের আদেশ-নিষেধ আঁকড়ে ধরেছ। আর আমরা আল্লাহর আদেশ আঁকড়ে ধরেছি। তাই তোমরা অপেক্ষায় থাক।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

"বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছো, তা তো এছাড়া কিছুই নয় যে, দু'টি মঙ্গলের একটি না একটি আমরা লাভ করব। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় আছি যে, আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের হাতে তোমাদেরকে শাস্তি দান করবেন। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় আছি ।"

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

"(হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, (আমাদের) সকলেই প্রতীক্ষা করছে। সুতরাং, তোমরাও প্রতীক্ষা করো। কেননা, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কারা সরল পথের অনুসারী এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ?"

আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর এ আয়াতের মাধ্যমে সুসংবাদ দিচ্ছি:

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ

"এই তো আরেকটি দল, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে

মানবাধিকারের নামে পশ্চিমা ক্রুসেডরদের প্রতারণা!

আবু সালাহ

আমেরিকানরা নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতার মাঝে বসবাস করছে। আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী বাহিনী। এরা বিশ্বব্যাপী গণবিপ্লবের শেকড় কাটতে ব্যস্ত। অথচ তাদের জানা নেই, নিজেদেরই মৃত্যুর পথে তারা হাঁটছে। নিজেদের জন্যেই গর্ত খুঁড়ছে তারা। যখন ফেরাউনী প্রাসাদ হোয়াইট হাউস ধ্বসে যাবে, তখন এ জাতিকে রক্ষা করার মত আর কিছুই থাকবে না। অচিরেই তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

إنهم كانوا قوما كافرين

'তারা সকলেই হচ্ছে এক কাফের সম্প্রদায়'

"মানবাধিকার" পরিভাষাটি বাস্তবিকপক্ষে দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতিগুলোকে নিজেদের অনুগত করে রাখার জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ ও মাধ্যম। এই "মানবাধিকার" কথাটার ভেতর যে কত কিছু লুকিয়ে আছে, বিশ্লেষকদের পক্ষে এক বাক্যে সেটাকে উঠিয়ে আনা অথবা অলঙ্ঘনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো মূলনীতি দিয়ে সেটাকে সংজ্ঞায়িত করা আসলেই দুষ্কর। আর এ কারণেই বড় বড় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের ইচ্ছে ও সুবিধামতো এই পরিভাষার ব্যাখ্যা করেছে। এখন যে রাষ্ট্র, জোট থেকে বেরিয়ে পড়বে, মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে তার সর্বস্ব লুটে নেয়ার পায়তারা শুরু হয়ে যাবে। অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নে তার সার্বভৌমত্ব প্রকৃত অর্থে বিলীন হয়ে যাবে।

বস্তুত; আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘনকারী। অপরদিকে, তারাই আবার নিজেদের জনগণ ও স্বজাতির ক্ষেত্রে মানবাধিকারের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। বাস্তবতা এরকম, অন্যরা যেন মানুষই নয়! তারা যেন মানবসম্প্রদায়ের কাতারেই পড়ে না! পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের হাতে মানবাধিকার যতই লঙ্ঘন হোক, তাদেরকে কিছু বলা যাবে না! অন্যদের যেন অধিকার বলে কিছুই নেই!

শুধু পরিচয়কে কেন্দ্র করে রুয়ান্ডায় ১০ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং ইরাকে প্রায় একই সংখ্যক শিশু হত্যাসহ ন্যক্কারজনক বহু মানবতা-বিরোধী অপরাধের ঘটনার দিকে তাকাবার সময় নেই বিশ্বের কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর। সারাবিশ্ব তখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। ইরাক অবরোধ করে লাখ লাখ শিশু মারার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেছিল, 'এমনটাই ঘটবার ছিল। এটা ঠিকই হয়েছে'।

পূর্ব তুর্কিস্তানে হাজার হাজার মুসলিমদের হত্যা করছে কমিউনিস্ট চীনারা। ৩০ লক্ষ মুসলিমকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। মদ খেতে,শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষদেরকে গনধর্ষণ করা হচ্ছে। শিশুদের মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। ব্রেইন ওয়াশ করে কমিউনিস্ট বানানো হচ্ছে। মুসলিমদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করা হচ্ছে। মুসলিমদেরকে রোজার দিনে রোজা ভাঙ্গতে বাধ্য করা হচ্ছে। মসজিদগুলোকে মদের বারে পরিণত করা হচ্ছে।

কিন্তু এদের অধিকারের কথা বলার কেউ নেই। জাতিসংঘের পঞ্চপাণ্ডবের দৃষ্টিতে এরা মানুষ নয়। বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী - রোহিঙ্গারা। কিন্তু এখানে মানবাধিকারের পতাকা তোলার মতো কেউ নেই। কারণ বিশ্ব মোড়লদের দৃষ্টিতে এরা মানুষ নয়। শুধু কিছু খাবারের প্যাকেট আর কিছু তাঁবু পাঠিয়ে দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে, আদতে যা - কি শীতে কি গরমে - তাদের তেমন কোনো কাজেই আসছে না।

ককেশাস, বুলগেরিয়া আর ক্রিমিয়া উপকূলের মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সময় কোথায় থাকে মানবাধিকার? ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার হরণ, গুয়ানতানামো বে আর আবু গারিব কারাগারের নির্মমতার সময় কোথায় থাকে মানবাধিকার? গাজা অবরোধ ও চতুর্থ বারের মতো সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সময় কোথায় থাকে মানবাধিকার? আমাদের মা বোনদের কাফির মুশরিকরা ধর্ষণ করছে, ভাইদের জবাই করছে তবুও আমাদের মুখ বুজে সব সয়ে নিতে হবে, সহ্য করে যেতে হবে, ঘুরে দাঁড়ানো যাবে না, পাছে না আমাদের শত্রুদের চোখে আমরা বর্বর অসভ্য হয়ে যাই!

এ কেমন পরাজিত মানসিকতা!

মুসলমানদের কি অনুভব অনুভূতি বলে কিছু নেই? সুখ-দুঃখ নির্ণয় করতে পারা এবং উত্তেজিত হতে পারার নিজস্ব ক্ষমতা কি তাদের নেই? না শুধু আমেরিকা এবং ইউরোপই উত্তেজিত হতে পারে? তাদের নাগরিকদের কিছু হলে শুধু তারাই প্রতিশোধ নিতে পারে? দুর্বলদের সন্তানেরা যখন নিহত হতে থাকে, তাদের নারীরা যখন বিধবা হতে থাকে, তাদের সম্মান-সম্ভ্রম যখন ভূলুণ্ঠিত হতে থাকে, তখন উত্তেজিত হবার অধিকার কি দুর্বলদের নেই? ফাঁসির দড়িতে যখন তারা ঝুলতে থাকে, তখন প্রাণ বায়ু বের হওয়ার সময় দেহ কাঁপতে থাকাটা বীরত্ব, আভিজাত্য ও শিষ্টাচারের লক্ষণ নয়। অথচ শিষ্টাচার এমন একটি বিষয়, যার দরুন কখনো কখনো অন্যদের চেতনালোকে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

উসমানী খিলাফতের পতনের পর এ যাবত, আরব অঞ্চল এবং মুসলিম দেশগুলো যতটা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে, সেটা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিতদের লাঞ্ছনাকেও হার মানায়। জাতিসংঘ, সাধারণ পরিষদ কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের কাছে করুণা ভিক্ষা চেয়ে অধিকার ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং শক্তি লাগবে। ক্ষমতা লাগবে। তার আগে লাগবে এসমস্ত কুফুরি সংগঠনের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ।

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

'আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়'। [সূরা বাকারাহ ২:১৯৩]

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

'আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়'। [সূরা বাকারাহ ২:২৫১]

> পূর্ব তুর্কিস্তানে হাজার হাজার মুসলিমদের হত্যা করছে কমিউনিস্ট চীনারা। ৩০ লক্ষ মুসলিমকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। মদ খেতে,শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষদেরকে গনধর্ষণ করা হচ্ছে। শিশুদের মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। ব্রেইন ওয়াশ করে কমিউনিস্ট বানানো হচ্ছে। মুসলিমদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করে হচ্ছে। মুসলিমদেরকে রোজার দিনে রোজা ভাঙ্গতে বাধ্য করা হচ্ছে। মসজিদগুলোকে মদের বারে পরিণত করা হচ্ছে। কিন্তু এদের অধিকারের কথা বলার কেউ নেই।

দুই মুজাদ্দিদ

উসামা বিন লাদেন ও আযযাম: পরস্পর সাংঘর্ষিক, নাকি ভিন্নধর্মী!

"আধুনিক জিহাদের দু'টি ধারা: বিন লাদেন ও আযযাম" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের উপর কিছু আপত্তি

প্রথম আসর: ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ'র ফিকহী ধারার মূলকথা

খাত্তাব বিন মুহাম্মদ আল-হাশিমী

সম্প্রতি 'মাজাল্লাতু হক' পত্রিকা "আধুনিক জিহাদের দু'টি ধারা; ইবনে লাদেন ও আযযাম"- শিরোনামে তাদের জনৈক লেখকের একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। অতঃপর 'মুনতাদাল উলামা' ও 'আল-মাহাদুল মিসরী লিদ-দিরাসাত' সাইট দু'টি ইন্টারনেট জগতকে তার দ্বারা আলোড়িত করে ফেলে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও তাদের পরিচালিত নিয়মিত সাইটগুলোতে তা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করে। আমি শহীদ ইমাম আব্দুল্লাহ আযযামের আদর্শের একজন অনুসারী ও তাঁর ছাত্র, তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছি, তাঁর কিতাবের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেছি এবং তাঁর অনেক ছাত্রদের সঙ্গে উঠা-বসা করেছি। তাই আমি গভীর মনোযোগ ও অনুসন্ধিৎসার সাথে প্রবন্ধটি পাঠ করলাম। আমি তার মধ্যে অনেকগুলো চিন্তাগত ভ্রান্তি, যৌক্তিক বিচ্যুতি ও ঐতিহাসিক ভুল দেখতে পেয়েছি। এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করা, সমালোচনা করা, সংশোধন করা ও পর্যালোচনা করা জরুরি। বিশেষ করে, যেহেতু তা দুই শায়খ ইমাম আব্দুল্লাহ আযযাম ও কমান্ডার উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র ব্যাপারে।

আর এখন তা প্রকাশের যথোপযুক্ত সময়ও বটে, যাতে পাঠকবৃন্দ এমনসব চিন্তাগত ভ্রান্তি ও যৌক্তিক বিভ্রাটে আটকে না পড়েন, যা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কর্মরত সমসাময়িক ধারা-পদ্ধতিগুলোর বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার শাস্ত্রীয় নীতি থেকেই বহু দূরে।

সর্বপ্রথম, লেখকের বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনায় মনোযোগ দেওয়ার পূর্বে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেশ করা প্রয়োজন:

১. ইমাম আযযাম রহিমাহুল্লাহ হলেন একজন আলিম, শরয়ী ফকীহ, দাঈ ও প্রশিক্ষক। পক্ষান্তরে, শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ হলেন একজন সামরিক কমান্ডার, অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ, জিহাদী ফিকহের পণ্ডিত এবং আল্লাহর পথে জিহাদের একজন বিত্তবান অর্থায়নকারী ।

২. শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ ১৩৯৯ হিজরীতে আফগানিস্তানে পৌঁছেন। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ১৪০২ হিজরীতে সেখানে পৌঁছেন এবং বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলোতে শায়খ উসামাই ছিলেন মূল অর্থায়নকারী। তারপর, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে আরব মুজাহিদগণের পৃথক সাংগঠনিক সামরিক কার্যক্রমের ব্যাপারে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

অতঃপর, জাজির যুদ্ধজয়ের পর এ মতপার্থক্য শেষ হয়ে যায় এবং এভাবেই বর্তমান জিহাদী ধারার নীতিমালা প্রণীত হয়। অতঃপর, শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ১৪০৯ হিজরীতে শহীদ হয়ে যান। তারপরে শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এমন একটি জীবন অতিক্রম করেন, যেটা শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ দেখেননি। আর তা হল শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের পর দীর্ঘ ২৩ বছরে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে লড়াইয়ের বিস্তৃতি। আমরা, আমাদের বর্তমান জাতির ইতিহাসে এ দুই মহান ব্যক্তির নীতি তুলনা করতে গেলে আমাদের জন্য এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু 'এ দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তিই, তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই' একথা বলাও মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে ঠাট্টা করার নামান্তর।

আমি বিগত কয়েক দশকে আমাদের উম্মাহর মহান ব্যক্তিদের জীবনীর প্রতি দৃষ্টি বুলিয়েছি, বিশেষ করে একই ধারার অনুসারীদের মাঝে, যাঁরা ইলমী, চিন্তাগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে একই নীতির অনুসারী ছিলেন। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে একজন শিষ্যের মাঝেও তাঁর শায়খের হুবহু সাদৃশ্য দেখিনি। এটা সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নীতির পরিপন্থী। তিনি মানুষের মাঝে যে পদ্ধতিতে তাদের স্বভাব, প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছা-মনোবল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বণ্টন করেছেন তার বিরোধী।

আপনি চাইলে "আল-উরওয়াতুল উছকা" এর লেখক শায়খ জামালুদ্দীন আফগানী ও তার শিষ্য মাহমুদ আব্দুহুর প্রতি দৃষ্টি দিন, তাঁরা কি উভয়ে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ? আপনি মাহমুদ আব্দুহু ও তাঁর শিষ্য রশীদ রেজার দিকে দৃষ্টি দিন। আরো বলুন, মুহাম্মদ কুতুব কি হুবহু তাঁর ভাই ও উস্তাদ সায়্যিদ কুতুবের মত ছিলেন?

বশীর ইবরাহীম কি হুবহু ইবনে বাদিসের মত ছিলেন? সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ আর তাঁর স্থলাভিষিক্ত সায়্যিদ ইসমাঈল শহীদ রহিমাহুল্লাহ কি হুবহু তাঁদের দাদা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর মত ছিলেন? আবুল হাসান আলী নদভী কি হুবহু তাঁর শায়খ কান্ধলভীর মত ছিলেন? একই কথা বলুন মুহাম্মদ খিযির হুসাইন, তাহির ইবনে আশুর, মালিক ইবনে নাবী আলকাওকাবী, আব্দুল কারী আল-খাত্তাবী, ওমর মুখতার ও অন্যান্যদের ব্যাপারে। চাই তাঁরা ইলমের ময়দানের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হোন, কিংবা গবেষণা, রাজনীতি, জিহাদ ও লড়াইয়ের ময়দানের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হোন। আপনি কাউকেই তার শায়খের হুবহু কপি পাবেন না। যেকোনো পাঠক ও অনুসন্ধানীর নিকটই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার।

মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বভাবগত পার্থক্যগুলো বোঝার মাধ্যমেই কোনো ধরণের বে-ইনসাফী ও বৈষম্য ব্যতীত সঠিক তুলনা করা যায়। কারণ মানুষ তার পরিবেশের দ্বারা লালিত-পালিত হয়। স্বভাবগত ভাবেই মানুষ সামাজিক, যেমনটা ইবনে খালদুন তার মোকাদ্দামায় বলেছেন। আমি উক্ত প্রাবন্ধিকের মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছি। তাতে আমি দেখেছি, তিনি তার পাল্লাকে উঁচু নিচু করেছেন, পাত্রে কম-বেশি করেছেন। সেই ইনসাফের সাথে তাকে সমান করেননি, যে ইনসাফের দ্বারা সপ্তাকাশ সপ্ত জমিন টিকে আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহই লেখকের হিসাবরক্ষক। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। তবে, এসব কিছুর অর্থ এটা নয় যে, একজন মানুষ ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিষ্কলুষ। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই ইনসাফ কাম্য।

প্রথম আপত্তি: দু'টি ধারা, নাকি একই ধারা?

লেখক তার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছে, 'কেউ কেউ মনে করেন যে, জিহাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জিহাদের ক্ষেত্রে ইবনে লাদেন ও আল-কায়েদার নীতিমালা মূলত আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, উভয় ধারার চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির মাঝে বিস্তর ব্যবধান। উভয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই'।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, লেখক বর্তমান যুগের এ দু'টি জিহাদী ধারার গতিবিধির যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দু'টি ধারণা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলেন। অতঃপর, এ বিষয়ে আলোচনা করলেন যে, দ্বিতীয়টি কি প্রথমটিরই পূর্ণতা দানকারী ও প্রসারিত রূপ কি না? নাকি উভয়টার মাঝে বিস্তর ব্যবধান আছে? তথা লেখকের ভাষায়- নাকি উভয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি জানি না, লেখক কী কারণে তৃতীয় মতটি উল্লেখ করতে ভুলে গেলেন, যেটা অনেক বিশ্লেষক ও গবেষকদের নিকট অগ্রগণ্য ধারণা। তা হল - ইবনে লাদেনের জিহাদী আদর্শ হুবহু ইমাম আযযামেরই আন্দোলন ও সংস্কারমূলক আদর্শ। আযযাম হলেন এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাকারী, শরয়ী আলেম এবং কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নববী উত্তরাধিকারের বাহক। আর ইবনে লাদেন হলেন তাঁর আধ্যাত্মিক পিতার নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নকারী সামরিক কমান্ডার এবং সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নকারী।

সে হিসাবে জিহাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জিহাদের ক্ষেত্রে ইবনে লাদেনের আদর্শ, আব্দুল্লাহ আযযামের দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশও নয়, কিংবা এমন বিপরীতমুখী দু'টি আদর্শও নয়, যাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে লেখকের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে সে সময়, যখন তার অল্প কয়েকদিন পূর্বে শায়খ উসামার মা 'উলইয়া গানিম' (আল্লাহ তাকে কল্যাণের সাথে সমাপ্তি দান করুন) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, শায়খ আযযাম, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের একজন সদস্য, যিনি তাঁর ছেলের বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত দিকনির্দেশনা লাভের মাধ্যম ছিলেন। আর এটা হয়েছিল, যখন উসামা, জেদ্দা শহরে তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পড়াশোনা করেছিলেন।

এটাই জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, শায়খ আযযাম ও তাঁর ছাত্রের মাঝে এমন মজবুত সম্পর্ক ছিল, যা ছিন্ন হবার নয়। অথচ, এই লেখক তার প্রবন্ধের শুরুতে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন, উভয়টি পরস্পর-ভিন্ন দু'টি ধারা, আর পর্যালোচনার বিষয় হল; দ্বিতীয়টি কি প্রথমটির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ?

নাকি উভয়টি এমন বিপরীতমুখী যে, একটি হলে অপরটি হতে পারবে না আর একটি না হলে অপরটি অবশ্যই হবে! প্রকৃতপক্ষে, সিংহভাগ প্রাচ্যবিদ বিশ্লেষক ও পশ্চিমা সাংবাদিকরা এ মত পোষণ করে যে, 'ইবনে লাদেন ও আযযামের একই আদর্শ হিসাবে তাঁদের মাঝে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল, যা বিভক্ত হওয়ার নয়'। আর এটিই বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে যৌক্তিক। বিশেষ করে, যেহেতু আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের সময় তাঁদের উভয়ের যে জিহাদী ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা পরিচালনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন প্রথমজনের কর্মগত অংশীদার ছিলেন। তাই, যখন শরয়ী আলেম চলে গেলেন আর কোনো নববী ওয়ারিস আলেম তার স্থলাভিষিক্ত হল না, তখন শায়খ উসামা বিন লাদেন ও তাঁর জিহাদী আন্দোলনের সাথীগণ নিজেদের জান-মালের মাধ্যমে সেই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেন, যার সবচেয়ে কঠিন দুর্ঘটনা ছিল উক্ত ধারার মহান শায়খ ইমাম আযযামের আকস্মিক নিহত হওয়া।

সহজে বোঝার জন্য মনে করুন, আমরা ইসলামের প্রথম জিহাদী বিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পাঠ করছি- যদিও আমরা স্বীকার করি যে, সেটার মাঝে আর তার অনুষঙ্গ তথা বর্তমান জিহাদী ধারার মাঝে বিরাট পার্থক্য ও ব্যবধান আছে- তখন কেউ যদি লিখে -

> **'কেউ কেউ মনে করেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র জিহাদী আদর্শ মূলত শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী আদর্শের, বিশেষ করে তাঁর আন্তর্জাতিক জিহাদী আদর্শের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ। আর অপর একদল মনে করেন, উভয় আদর্শের চিন্তা ও কাজের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। উভয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত, পরস্পরের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।,,**

আগত লাইনগুলোতে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মগত উত্তরাধিকারগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। সেই সাথে উভয়ের মধ্যকার ঐক্যমত্য ও মত-ভিন্নতার বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। উভয়ের পূর্ব-ঘটিত ও দুর্লভ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে তাদের সর্বশেষ আদর্শের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এ জট ছাড়ানোর ও বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে'। তাহলে আমরা কি এটাকে ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা ব্যতীত কিছু ভাবতে পারি?

একই নীতি-আদর্শের মাঝে জট ছাড়ানো ও বাস্তবতা তুলে ধরার ব্যর্থ ও অনর্থক চেষ্টার এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই মিলে। বিশেষত, একজন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী আলেমের মাঝে আর তাঁরই সঙ্গে যুক্ত প্রধান অর্থায়নকারী ও সামরিক কমান্ডারের মাঝে। ধরুন,আমি শায়খ আহমাদ ইয়াসিন ও কমান্ডার ইয়াহইয়া আইয়্যাশ, এ দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মগত উত্তরাধিকারগুলো বিশ্লেষণ করলাম। তারপর উভয়ের মধ্যকার ঐক্যমত্য ও মত-ভিন্নতার বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। সেইসঙ্গে উভয়ের পূর্ব-ঘটিত ও দুর্লভ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে তাঁদের সর্বশেষ আদর্শের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে উভয়ের আদর্শের মধ্যকার জট ছাড়ানোর জন্য একটি প্রবন্ধ লেখলাম। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একই গর্ভাশয় থেকে নির্গত সিয়ামিজ যমজকে পার্থক্য করার ব্যাপারে বাকচাতুর্য ও ভাষার তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে যে উন্নতিতে পৌঁছে গেছে (যেমন- জীবন্ত ডিম্বাণুতে সফলভাবে অস্ত্রোপচারের ফলে এই দৃশ্যমান ভাগ দেখা যাচ্ছে), তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামী ইতিহাসের একই জিহাদের আদর্শ পুরুষদের জোটে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করলাম, তাহলে এটাকে নিজের নির্বুদ্ধিতা ও চিন্তার দৈন্যতা ব্যতীত কী মনে করবো?

দ্বিতীয় আপত্তি: শায়খ আযযাম কি ফিকহী মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে কঠোরতাকারী, নাকি সংমিশ্রণকারী?

লেখক, উভয় শায়েখের মাঝে যৌথভাবে বিদ্যমান মৌলিক পাঁচটি নীতির মধ্যে একটি উল্লেখ করেন; প্রতিটি মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এ মাসআলাটি হল, উভয়ের মাঝে কার্যত সাদৃশ্যগুলোর অন্যতম। এমনকি শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় তার স্বভাবের বিপরীতে কঠোরতা করতেন এবং অনেক সময় যারা এটাকে ফরজে কিফায়া বলে ফাতওয়া দেন, তাদের ব্যাপারে কঠিন ভাষা ব্যবহার করতেন।

লেখকের এই কথাটা- 'এ মাসআলায় তার স্বভাবের বিপরীতে কঠোরতা করতেন এবং অনেক সময় যারা এটাকে ফরজে কিফায়া বলে ফাতওয়া দেন, তাদের ব্যাপারে কঠিন ভাষা ব্যবহার করতেন' এটা শায়খের প্রতি ও শায়খের ফিকহী আদর্শের প্রতি মন্দ ইঙ্গিত। তার কথার অর্থ দাঁড়ায়, শায়খ ফিকহী বিধানগত মাসআলায় কঠোরতা করতেন না, তিনি শুধু মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার মাসআলায় কঠোরতা করেছেন। মাঝে মাঝে নিজের স্বভাবের বিপরীতে, যারা এর বিপরীত ফাতওয়া দিত, তাদের উপর কঠোর হতেন যেমনটা উক্ত লেখক বর্ণনা দিলেন।

অথচ যারাই শায়খের কিতাবসমূহ পড়েছেন কিংবা তার সরাসরি শিষ্যত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নিকট এটি স্পষ্ট যে, শায়খ কুরআন-সুন্নাহর দলিল থেকে উদঘাটিত বিধি-বিধানের আযীমত তথা চূড়ান্ত রূপটি গ্রহণ করার ব্যাপারে কঠোরতা করার প্রতিই আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কারও পরওয়া করতেন না। শায়খ কখনো কোনো একটি ফিকহী মাসআলায়ও ফিকহী সংমিশ্রণের পন্থা অবলম্বন করেননি, যেটা আজ তাঁর ব্যাপারে জোর করে প্রচার করা হচ্ছে।

মূলত, আধুনিক সহজ নীতির উপর চলার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে হিজরী ১৩শ শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর শেষ দশকে। কতগুলো স্লোগানের অধীনে, যেমন: 'করতে পার, সমস্যা নেই', 'উদ্দেশ্য সন্ধানী ফিকহ', 'সংখ্যালঘু ও দুর্বল-বান্ধব ফিকহ' এজাতীয় আরো কতগুলো স্লোগান, যেগুলো শায়খ কারযাবী ও আওদার মত লোকেরা বাজারজাত করেছে। আল্লাহ তাদের সকলকে মাফ করুন এবং সঠিক পথের দিশা দিন। আর বর্তমানে তার প্রচলন ঘটাচ্ছে "ফিকহী সংমিশ্রণ" ও "উদ্দেশ্য সন্ধানী ফিকহ"এর পতাকাবাহী রিসূনী ও ইবনে বীহ।

অনস্বীকার্য বাস্তবতা হল, শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ নতুন কিছু নিয়ে আসেননি, কারণ 'জিহাদের বিধি-বিধানে নতুন কিছুই নেই'। বরং শায়খ রহিমাহুল্লাহ সর্বকালের ও সকল স্থানের উলামায়ে কেরামের ধারাবাহিক ইজমাগুলোই বর্ণনা করেছেন। আর তা হল, মুসলিম দেশের এক বিঘত জমিও যদি কাফের শত্রুরা জোর করে দখল করে নেয় কিংবা দখল করার ইচ্ছা করে, তাহলে প্রতিটি সক্ষম মুসলিম পুরুষের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে মিলে তা কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করতে না পারে, যদিও এ ফরজে আইন সমস্ত মুসলিমদেরকে শামিল করে নেয়। আর এ ফরজিয়্যাত কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্পেন পতন হওয়ার পর থেকেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

তাই লেখকের এ কথাটি 'এ মাসআলাটি হল, উভয়ের মাঝে কার্যত সাদৃশ্যগুলোর অন্যতম। এমনকি শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় তার স্বভাবের বিপরীতে কঠোরতা করতেন'- এটা অবিবেচনাপ্রসূত। কারণ এ মাসআলা ইসলামের অনুসৃত সকল মাযহাবের সকল আলেমদের মাঝে বাস্তবিক, প্রায়োগিক, কার্যত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যের অন্যতম ও প্রকাশ্যতম মাসআলা। শায়খ আযযাম ও তার সঙ্গী উসামা বিন লাদেন তো চৌদ্দশত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা অসংখ্য ফুকাহাদের বর্ণনা সমুদ্রের একটি ফোঁটা মাত্র। যার ব্যাপারে সর্বদাই ঐক্যমত্য চলে এসেছে। একমাত্র আমাদের বর্তমান যামানাই শুধু ব্যতিক্রম, যে যামানায় 'আলেমদের শাসক' এর অনুপস্থিতিতে 'শাসকদের আলেমরা' প্রভাবশালী হয়ে গেছে। আর ঐ সমস্ত বেতনভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ফুকাহাদের কথাবার্তা ছড়িয়ে পড়েছে, শরয়ী রাজনীতি সংক্রান্ত মাসআলায় যাদের স্বতন্ত্র বক্তব্য ধর্তব্যই হতে পারে না। স্বার্থ, সুবিধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার কারণে ওই সম্প্রদায় এমন কথাবার্তা লিখছে, যা অচিরেই বিচার দিবসে তাদের অনুতাপের কারণ হবে।

আর লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী শায়খ রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় যে কঠোরতা করেছেন, তাও সেই কারণেই যা এই লেখক নিজ কলমেই লিখেছেন। আব্দুল্লাহ আযযামের ছিল শাস্ত্রীয় মন-মানসিকতার। অর্থাৎ তিনি বিধি-বিধান উদঘাটনের বিভিন্ন পন্থা ও নীতিমালা এবং তা থেকে যত শাখাগত মাসআলা বের হয়, যেগুলো গ্রহণযোগ্য সুন্নী মাযহাবসমূহের ইখতিলাফের বিস্তৃত গণ্ডির ভিতরে পড়ে, তা জানতেন। আর নিঃসন্দেহে রাজনীতি ও যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কেও অনেক মাসআলা রয়েছে।

তাই, উসূলবিদ ও ফকীহ শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ইসলামের নিকট-অতীতের ইতিহাস জানতেন। বিশেষ করে মুসলিম আলজেরিয়ার ইতিহাস, যখন বর্বর ফ্রান্স তা দখল করে নিয়েছিল এবং তার মাটিতে দশ লক্ষেরও অধিক মুসলিমকে হত্যা করেছিল। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, কীভাবে ফ্রান্স ফিকহের কিতাবসমূহ হতে জিহাদের অধ্যায়গুলোকে উঠিয়ে দিয়েছিল এবং আলেমদেরকে হাদিসের কিতাবসমূহে জিহাদের অধ্যায়গুলো পড়াতে নিষেধ করে দিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, কীভাবে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ও তাদেরকে মুসলিমদের দেশ থেকে বের করার আন্দোলনকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ফেতনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এবং অধিকাংশ আলেমও এ মতের উপর একমত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ আবরণ দূর হওয়ার সাথে সাথেই এবং এ ত্রাস ও লালসার অবসান ঘটতে ঘটতেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। দরবারি আলেমরা ঐ সকল লোকদেরকে শহীদ বলে অভিহিত করতে লাগল, যাদেরকে তারা একসময় বিদ্রোহী এবং ফেতনাবাজ বলত। আজও পর্যন্ত আলজেরিয়াকে দশ লক্ষ শহীদের দেশ বলা হয়।

তাই এটি শায়খ আব্দুল্লাহ আযযামের দূরদর্শিতাই ছিল যে, তিনি সেইদিন আসার পূর্বেই এ মাসআলায় কঠোরতা করেছিলেন, যে দিনটিকে তিনি তাঁর চিন্তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে দেখেতে পেরেছিলেন। আর আমরা এখন বাস্তবে দেখছি যে, ইবনে বীহের নেতৃত্বে 'মুসলিমদের বিজ্ঞ সমাজ' এবং তার 'আধুনিক হিলফুল ফুযুল' মুসলিম উম্মাহর জিহাদের অপরিবর্তনীয় বিধানগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এমনকি জিহাদি ফিকহের অবস্থা এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে যে, আমরা বেতনভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ফুকাহাদের মুখ থেকে একথাও শুনতে পাচ্ছি যে, বর্তমান যুগের চাহিদা ও কথিত উদ্দেশ্য সন্ধানী ফিকহের আলোকে জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তগুলো এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ধারাগুলো জিহাদের অনেক বিধি-বিধানকে রহিত করে দেয়। এই গাঢ় ফিতনা মুসলিম উম্মাহ থেকে এটাই দাবি করছে যে, তারা তাগুতি 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদ' এর আইনগুলো এবং কথিত আন্তর্জাতিক শান্তির নীতিগুলো মেনে নিবে!!

তাই একজন স্বাধীনচেতা লেখক হলে তার উপর আবশ্যক ছিল, শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় কেন তাঁর স্বভাব বিরোধী কঠোরতা আরোপ করতেন, তা স্পষ্ট করে তোলা। 'উদ্দেশ্য সন্ধানী সংখ্যালঘু বান্ধব ফিকহ' এর শায়খদের অনেকেই পরাজিত মানসিকতা ও চিন্তার কারণে যে তিক্ত বাস্তবতাটি প্রকাশ হওয়া পছন্দ করেন না, তা হল; আজ ইসলামের জিহাদী পরিভাষাগুলো সমূলে উৎপাটিত হওয়ার এক কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন- গাদ্দাফী সরকারের সরকারি ফুকাহারা অনেকবার বলেছে যে, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক জিহাদের পরিভাষাগুলো নতুন পরিভাষা। এগুলো আমাদের আধুনিক যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে জিহাদ তখনই হত, যখন কোনো রাষ্ট্রীয় চুক্তি বা সমঝোতা না থাকত। পক্ষান্তরে, বর্তমানে এ সকল স্থায়ী চুক্তি ও সমঝোতার শর্ত ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে জাতিসঙ্ঘ পরিষদের পাঁচ উপাস্য।

আর জিহাদের ফিকহী মাসআলাসমূহের অন্যতম শাখাগত মাসআলা, দাস-দাসী করার মাসআলাগুলোকে তো শায়খ আযযাম ও উসামা বিন লাদেনের সামর্থ্যকালেই পাপিষ্ঠ হাতগুলো ফিকহের কিতাবসমূহ হতে মুছে দিয়েছে। যে সকল কারণে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ এ মাসআলায় কঠোরতা করেছিলেন, এটি হল তার মধ্যে অন্যতম। যা শায়খ রহিমাহুল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাসেরই অংশ ছিল। অর্থাৎ তিনি ইসলামের ফিকহী বিধানগুলোতে কোনো ধরণের সংমিশ্রণ বা সুযোগ সন্ধান না করে তা পরিষ্কারভাবে বলতে গর্ববোধ করতেন।

তৃতীয় আপত্তি: নৈতিক জিহাদ ও মনস্তাত্ত্বিক জিহাদের মাঝে পার্থক্য করার বিদআত

লেখক বলেছেন (আল্লাহ তাকে মাফ করুন), যদিও উভয় ধারার মাঝে পূর্বোল্লেখিত একতা ও মিলগুলো আছে, কিন্তু তার সাথে এমন অনেকগুলো গুরুতর ও স্পর্শকাতর মত-বিরোধপূর্ণ বিষয়ও আছে, যেগুলো কিছুতেই ঐক্যমত্য বিষয়গুলো থেকে গুরুত্বে ও প্রভাবে কম নয়।

আমরা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোকে পাঁচটি পয়েন্টে উল্লেখ করব:

প্রথমত, মনস্তাত্ত্বিক জিহাদ থেকে নৈতিক জিহাদ: শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ মুজাহিদদের জন্য অস্ত্র বহনের পূর্বে কিছুটা নৈতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণেরও আবশ্যকীয়তা অনুভব করতেন। যেন কখনো বন্দুকের নল মুমিনদের মাথার দিকে ঘুরে না যায়...। লেখকের উল্লেখিত বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তি ও পর্যালোচনা রয়েছে। তার এই সংক্ষিপ্তকরণের মাঝে এমন অনেকগুলো ভুল রয়েছে, যা সত্যের ধারেকাছেও নেই। কারণ শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ যদিও হুবহু শায়খ উসামার মত মুজাহিদদের জন্য অস্ত্রবহনের পূর্বে কিছুটা নৈতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আবশ্যকীয়তা অনুভব করতেন, যেন বন্দুকের নল মুমিনদের দিকে ফিরে না যায়, কিন্তু তিনি মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুরুত্ব দিতেন। যেটা প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিগত প্রশিক্ষণই, যার উপর আল্লাহ মানুষ ছাড়াও সমস্ত প্রাণীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তা হল- নিজের সম্মান, জীবন ও সন্তান-সন্ততির প্রতিরক্ষা করা। শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ ফিলিস্তিনে জিহাদের যুগ থেকেই এই মানসিকতা লালন করতেন। তিনি দেখলেন, আফগানরা মানবিক, প্রকৃতিগত সম্মান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই মানসিকতা গ্রহণ করেছে, তথা জুলুমকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নিজের থেকে লাঞ্ছনা ও হীনতা প্রতিহত করার মানসিকতা। তারপর তিনি তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রেও এটার অনুমোদন করেন। অতঃপর, তাঁর মৃত্যুর পরে আল-কায়েদাও এই প্রকৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে।

এগুলো মূলত মানুষের সম্মানজনক জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং জালিম ও মাজলুমের মধ্যকার সংঘাতের দাবি। এছাড়া, কুরআন তো তার অনুসারীদেরকে এই সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক নীতিগুলো পালন ও অনুসরণ করার আহ্বান করেছে।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর যুগ যারা পেয়েছেন এবং যারা তাঁর কিতাবাদি পড়েছেন, তারা জেনে থাকবেন যে, যখন সোভিয়েত শক্তিগুলো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তিনি মুসলিমদেরকে 'ঈমানী ও আখলাকী তারবিয়া" তথা নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের আদেশ করেননি, যেটা তার নিকট সেই শক্ত ভিত্তির ন্যায় ছিল, যার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া ব্যতীত একটি আদর্শ জিহাদ দাঁড়াতেই পারে না। যেমনটা লেখক বলেছেন। বরং তিনি আফগানবাসীর জন্য প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর নগদ বের হওয়া ফরজ সাব্যস্ত করতেন, চাই সে সামান্যও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ না করুক না কেন। এমনিভাবে যারা পেশোয়ারে পৌঁছত, তাঁরা সংক্ষিপ্ত একটি শরয়ী কোর্স করতেন। আর আফগানদের সাথে কীভাবে আচার-আচরণ করতে হবে সে ব্যাপারে কিছু উপদেশ শুনতেন। তারপরই তাঁদেরকে জাজির পর্বত-উপত্যকায় ও হিন্দুকুশ পর্বতচূড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হত নিজেদের সম্মান রক্ষার যুদ্ধ করার জন্য।

বাস্তবতা জানতে আগ্রহী পাঠকগণ শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর সেই প্রশ্নোত্তরটি পড়তে পারেন, যা জনৈক মুজাহিদের পক্ষ থেকে তাঁকে করা হয়েছিল। প্রশ্নটি হল, 'আমরা কি ওই সকল লোকদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করব, যারা এখনো ইসলামী নৈতিকতার গ্রহণযোগ্য মাপকাঠিতেই উঠতে পারেনি' (মাউসুআতুয যাখায়ির ১/১৩৫) তাহলে পাঠক এই লেখকের বক্তব্যের অসাড়তা ও বাস্তব-বিরোধিতা জানতে পারবেন।

এতকিছু সত্ত্বেও কিন্তু শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহর জীবনের শেষ সময়ে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ান লাল ভাল্লুকগুলো চলে যাওয়ার পর বন্দুকের নল আফগান মুসলিমদের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। তখন সর্বপ্রথম যিনি এখান থেকে সরে গিয়ে সুদানে সফর করে মুসলিম হত্যার ফিতনা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে এই লেখক বলেছেন।

পক্ষান্তরে, উসামা বিন লাদেনের ভাষণে ও কার্যক্ষেত্রে আল-কায়েদার মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক প্রশিক্ষণগুলো গ্রহণের দাওয়াতটাই বড় আকারে প্রাধান্য পায়। সাধারণ নৈতিক প্রশিক্ষণগুলো থেকে এটাকেই খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লেখকের এটা বড়ই বেইনসাফি হয়েছে যে, তিনি শায়খ উসামার তারবিয়াতি প্রচেষ্টাগুলোকে হজম করে ফেলেছেন, একটি মুজাহিদ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ যেগুলোর প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর যত্নশীলতার একটি প্রমাণ হল- তিনি নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন আলেমদেরকে যারপরনাই গুরুত্ব দিতেন। একারণেই তিনি শায়খ আবু হাফস, আবু মুহাম্মদ আল-মিসরী, আবুল গাইস, হুসাইনান, নায্যারী, বালিদী, আবু ইয়াহইয়া ও অন্যান্য আলেমগণকে মুজাহিদদের চরিত্রগঠন, আত্মশুদ্ধি করা ও নৈতিকতা শিক্ষাদানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এমনকি চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনের অনেকগুলো প্রোগ্রাম শায়খ নিজেও তত্ত্বাবধান করতেন।

আর যে বাস্তবতাটি এই প্রাবন্ধিকের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার কথা নয়, তা হল; যারাই শায়খ উসামা ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে চলা ফেরা করেছেন, তারা ,তাঁদেরকে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক চরিত্রবান হিসাবেই পেয়েছেন। শায়খ আতিয়্যাতুল্লাহর মত ব্যক্তিগণ তো শায়খ উসামার প্রশিক্ষণেরই ফল। শায়খ আতিয়্যা নিজে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, এটা তাঁর উপর আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত যে, তিনি শায়খ উসামার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। অতঃপর, শায়খ উসামাই তাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে ইলম অন্বেষণের জন্য পাঠিয়েছেন। আর এই লেখক শায়খ আযযামের ব্যাপারে যা বলেছেন, সেটাকেও বাস্তবতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা দরকার। কারণ লেখক, শায়খ আযযামের সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাষণগুলোর এক বিরাট অংশ সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ করে তাঁর সে সকল কিতাবগুলোর ব্যাপারে, যেগুলোতে তিনি শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা এবং ঈমানী আখলাকী তারবিয়ার অংশ হিসাবেই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রশংসিত, সন্ত্রাসের দ্বারা গর্বিত হওয়ার প্রতি আহ্বান করেছেন।

যেমন তার কিতাব "কাফেলায় যুক্ত হও", "মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা ফরজে আইনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরজ", "জিহাদের ঘোষণা", "আধুনিক জিহাদের শিক্ষা ও উপদেশমালা"।

শায়খ আযযামের চিন্তা-চেতনাপ্রসূত আল-কায়েদার মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক নীতিগুলোই সর্বাধিক স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর আকর্ষণীয় কিতাব "মুসলিম উম্মাহর জিহাদ" এর মাঝে। কারণ এর মধ্যেই তিনি আফগান জনগণ ও তাদের উলামা কর্তৃক তাদের শাসকদেরকে তাকফীর করা এবং তাদের উপর ধর্মত্যাগ ও ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার হুকুম আরোপ করার প্রশংসা করেছেন। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যুদ্ধ করা ও তাদের পতন ঘটানোরও প্রশংসা করেছেন, যেমনটা আল-কায়েদাও কারযাই, গাদ্দাফী, আলী সালেহ ও অন্যান্য তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে করেছে।

এমনিভাবে তিনি তাঁর "কাওয়াইমু মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা" নামক প্রবন্ধে (আয-যাখায়ির ২/১২০) কুফ্ফার নেতাদেরকে গুপ্তহত্যা করার নীতিমালা প্রণয়নের ভূমিকা প্রস্তুত করেন। গুপ্তহত্যার তালিকা তৈরি করতে ও তাগুতদের মস্তকগুলো বিচ্ছিন্ন করতে আদেশ করেন এবং উল্লেখ করেন যে, এটি একটি অবহেলিত ও পরিত্যক্ত সুন্নাহ। এটি আমাদের যুগে নতুন করে জীবিত করার চেষ্টা করা উচিত। তবে, তিনি এটাকে ঐ সমস্ত উলামাদের অনুমতির শর্তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করে দেন, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তানে ঘটিত সমসাময়িক কয়েকটি গুপ্তহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে মাওলবী জুল আহমাদ বাশতুনের ঘটনা বর্ণনা করেন, যে ফারিয়াব প্রদেশের অধিবাসী, নজীবুল্লাহ সরকারের সাথে বন্ধুত্বকারী একজন অসৎ আলেম ছিল। কীভাবে তাকে রাতের বেলা ঘুমের বিছানায় নিজ পরিবার, স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই হত্যা করা হল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শায়খ রহিমাহুল্লাহ এই অপারেশনের প্রশংসা করেন। এর জন্য এবং এর মত আরো অনেকগুলো ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট ভাইদেরকে মোবারকবাদ জানান।

উপরোক্ত আলোচনার উপর আরো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলব, শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ কিছু সংমিশ্রণকারী ফিকহ পরিত্যাগ করতেন এবং ইসলামের মৌলিক বর্ণনাগুলোকে আঁকড়ে ধরতেন।

যেগুলোকে "আল-কায়েদার সন্ত্রাসী ফিকহ" নামেও অভিহিত করে থাকে অনেকে। যেগুলো এই লেখক ও এরমতো লোকদের নিকট আল-কায়েদার মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক নীতিমালার বৈশিষ্ট্যাবলী হিসাবে গণ্য। এগুলো যে শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহও বলতেন, তার কয়েকটি উদাহরণ এই:

১. তিনি সোভিয়েত শক্তিগুলোর সাথে সহযোগিতাকারী মুসলিমগণকে মুরতাদ বলতেন। (১/৩০১-২/৩৪৭-৩৫৭)

২. নজীব সরকারের কর্মী আফগান বন্দীরা তওবা করলেও তাদের হত্যা করা বৈধ বলতেন, তাদের উপর মুরতাদ ও যিন্দিক হওয়ার হুকুম আরোপ করতেন। (১/৩০১-২/৩৪৭-৩৫৭)

৩. নজীব সরকারের সাথে বন্ধুত্বকারী আফগান মহিলাদেরকেও হত্যা বৈধ বলতেন। কেননা তারা মুরতাদ। (১/৩০৩)

৪. যুদ্ধের স্বার্থে আফগান সরকারের মুসলিম গোয়েন্দারা তওবা করলেও তাদের হত্যা করা বৈধ বলতেন। (২/৩৪৭)

৫. মুসলিম দেশগুলোর একদল শাসককে তাকফীর করতেন। যেমন: জামাল আব্দুন নাসের, গাদ্দাফী, সাদ্দাম, হাফিজ আসাদ, আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহ, বাবরাক কার্মাল প্রমুখ। (আয-যাখায়ির: ৩/১০০)

৬. সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও জানের মাধ্যমে জিহাদ পরিত্যাগকারী ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নামায পরিত্যাগকারীর মাঝে কোনো পার্থক্য করতেন না।

৭. কারাগারে কোনো নারী ইজ্জত হারানোর আশঙ্কা করলে তার জন্য আত্মহত্যা করা জায়েয, এমনকি ওয়াজিব বলতেন।

৮. শত্রুর ঘাঁটিতে আক্রমণের সময় কাউকে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে শোনা গেলেও যদিও তার থেকে বিপদের আশঙ্কা করা হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা জায়েয বলতেন।

৯. তিনি বলতেন, আফগান জিহাদে অর্থের প্রয়োজনের চেয়ে লোকের প্রয়োজন বেশি ।

মোটকথা, শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ সে সকল সমসাময়িক দুর্লভ আলেমদের মধ্যে একজন ছিলেন, যারা বিরাট সংখ্যক মুসলিম দেশের শাসকদেরকে প্রকাশ্যে তাকফীর করতেন। তাদের মুরতাদ হওয়া ও দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অকাট্য কথা বলতেন। এমনকি, শায়খ রহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবের কয়েক স্থানে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ও তাদের সহযোগিতা করে, যেমন সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীগুলো, তাদেরকেও কাফের ও মুরতাদ ফাতওয়া দিতেন। আল্লাহ চাইলে এ বিষয়টি দ্বিতীয় আসরে আমরা উত্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় আসরে আমরা এমন কিছু বাস্তবতা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করব, যেগুলোকে মানুষের চোখ থেকে আড়াল করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

বড়দের মধ্যে একমাত্র শায়খ আযযাম ব্যতীত কেউ জেগে উঠলেন না। (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন!) তাই বর্তমান আফগান জিহাদের ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলিমগণ শায়খ আযযামের পরিবারভুক্ত। সমসাময়িক জিহাদের ক্ষেত্রে সমগ্র আরবগণ শায়খ আযযামের পরিবারভুক্ত। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন এবং তাঁকে সেই প্রতিদান দান করুন, যা তিনি একজন আলেমকে তার জাতির পক্ষ থেকে দেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট কামনা করি, তিনি তাঁকে ও তাঁর উভয় সন্তানকে শহীদ হিসাবে কবুল করবেন।

আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

যে ব্যক্তি তার মালের মাধ্যমে এই সেবা সংস্থার দেখাশোনা করেছেন, তিনি হলেন ভাই আবু আব্দুল্লাহ উসামা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে লাদেন। আমি তাঁর জন্য অনেক দু'আ করি। আল্লাহর নিকট দু'আ করি আল্লাহ তাঁর পরিবার ও সম্পদে বারাকাহ দান করুন! আল্লাহর নিকট আশা রাখি, তিনি তাঁর মতো আরো অনেক লোক সৃষ্টি করবেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তার উপমা খুঁজে পাইনি। তাই আল্লাহর নিকট কামনা করি, ইয়া আল্লাহ,আপনি তাঁর দ্বীন ও সম্পদের হেফাজত করুন। তাঁর জীবনকে বরকতময় করুন।

স্বপ্ন মুমিনের জন্য সুসংবাদ

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নকে সুসংবাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে শেষ জামানার জন্য এটা বেশি কার্যকর। হাদিসে এসেছে-

ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا و ما المبشرات قال الرويا الصالحة.

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, '"আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সুসংবাদবাহী বিষয়াদি ছাড়া নবুওয়তের আর কিছু অবশিষ্ট নেই"। সাহাবাগণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুসংবাদবাহী বিষয়াদি কী? (উত্তরে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ভালো স্বপ্ন'। [সহীহুল বুখারী,হাদিস নং : ৬৭২১]

অপর এক হাদিসে এসেছে-

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكد رويا المومن تكذب و اصدقهم رويا اصدقهم حديثا و رويا المسلم جزء من ستة و اربعين جزء من النبوة.

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মুমিনের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা হবে। যে ব্যক্তি অধিক সত্যবাদী, তার স্বপ্নও অধিক সত্য হবে। মুমিনের স্বপ্ন হলো, নবুওয়তের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ'। [সুনানে তিরমিজি,হাদিস নং : ২২৭০]

স্বপ্ন হল আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। বিশেষ করে বিপদ এবং সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় যখন সাহায্যের সকল দরজা বন্ধ থাকে, তখন স্বপ্ন সাহায্যকারী হিসাবে কাছে আসে। মনোবল জোগায়। সান্তনার পরশ বুলিয়ে দেয়। মরুভূমিতে পানির অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরা ব্যক্তির জন্য পানি যেমন ঠিক তেমন ভূমিকা পালন করে।

তবে সাবধান, স্বপ্নের দ্বারা শরিয়তের কোনো আহকাম প্রমাণিত বা রহিত হবে না। কেননা, শরিয়তের হুকুম কেবলমাত্র ওহীর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, যেগুলো কোরআনে এবং হাদিসে লেখা আছে। তবে স্বপ্নের দ্বারা কোনো সন্দেহযুক্ত জিনিসের ব্যাখ্যা করা বা প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

স্বপ্ন বর্ণনার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। এব্যাপারে হাদিসে স্পষ্ট সতর্কবাণী এসেছে-

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين و لن يفعل.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার ভান করল যা সে দেখেনি, তাকে দুইটি যবের দানায় গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে কখনো তা করতে পারবে না'। [সহীহুল বুখারী,হাদিস নং: ৬৭৬৭]

আরেক হাদিসে এসেছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان افري الفري ان يري عينيه ما لم تريا.

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হলো আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখানো, যা চক্ষুদ্বয় দেখেনি (অর্থাৎ যা সে স্বপ্নে দেখেনি, এমন কিছু স্বপ্নে দেখেছে বলে দাবি করা অর্থাৎ একদম মিথ্যা বানোয়াট স্বপ্ন বর্ণনা করা)'।

এই হাদিসগুলো মাথায় রেখেই আমার দেখা কিছু স্বপ্নের কথা আজ আমাদের শুনাতে চাই। এই স্বপ্নগুলো আমি দেখেছিলাম কারাগারে থাকাকালীন সময়ে। এই স্বপ্নগুলোর মাধ্যমে মুজাহিদ ভাইদের সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আল্লাহর উপর ভরসা বেড়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

প্রথম স্বপ্ন:

আর এ স্বপ্নটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্বপ্নে দেখলাম- 'রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা পাগড়ি পরে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবার সবটুকু মুখস্থ করলাম। তিনি খুতবায় বর্তমান জামানার খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "বর্তমানে যারা এই ফিতনার যুগে যুদ্ধ করছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আমার উপর জরুরি"। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন'।

দ্বিতীয় স্বপ্ন:

এই স্বপ্নটা বেশ দীর্ঘ। তবে আমি স্বপ্নের সামান্য কিছু অংশ বর্ণনা করব- 'আমি একদিন ঘুমের মধ্যে আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। আল্লাহর কসম, আমার কাছে এটি দাউদ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের মত মনে হলো। তিনি মুজাহিদদেরকে বারবার এ কথাটা পুনরাবৃত্তি করছিলেন, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তোমরাই হকের পথে আছ..... তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তোমরাই হকের পথে আছ..... তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তোমরাই হকের পথে আছ.... তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তোমরাই হকের পথে আছ'।

এরপর আমি একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একজন বৃদ্ধ আলেমকে। অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন তিনি। আর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল প্রখর। সম্ভবত, ওই আলেম আমাকে বললেন অথবা আমি একটি আওয়াজ শুনলাম, 'আল্লাহ বলছেন, "মুজাহিদরা পেরেশানিতে আছে। তাঁরা অনেক দুয়া করে কিন্তু তা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না"।

এরপর আমি বেশ স্পষ্ট আওয়াজ শুনলাম, "আমি মুজাহিদদের উপর সন্তুষ্ট আছি এবং পরে কখনো তাদের উপর নারাজ হব না; এতে কি তারা খুশি নয়? তাদের চাওয়া আমি অচিরেই ফিরিয়ে দিব, তাদেরকে বিজয় দান করব এবং আমি তাদেরকে ভরপুর প্রাচুর্য দিব'।

আমরা দুয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের উপর এবং মুসলিম উম্মাহর উপর রহম করেন। আমাদেরকে সঠিক পথের উপর রাখেন। তিনি যেন আমাদেরকে ফিতনার অন্ধকার এবং নফসের খায়েশ থেকে রক্ষা করেন। যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই তখন যেন আমাদেরকে দৃঢ়পদে রাখেন। আমীন।
আপনাদের নেক দুয়ায় আমাদেরকে ভুলবেন না।

আব্দুল আজিজ আল মাদানী

সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ তো নয় যেন ইহুদীকরণের প্রতিযোগিতা!

ইহুদীদের সাথে ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে আরব সরকার বিশেষ করে সৌদি এবং আমিরাতের প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। এজন্য তারা অনেক কার্যকরী পদক্ষেপও নিয়েছে। এটা এখন আর আশ্চর্যের কিংবা নতুন কোনো বিষয় নয়। এতদিন যা গোপন ছিল, এখন এমন অনেক কিছুই প্রকাশ করার সময় এসেছে - এটুকুই। আরব-ইসরাইল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের এই প্রক্রিয়া কয়েক বছর আগে থেকেই জোরদারভাবে চালু আছে। বিগত সময়ে এই দুই সরকার জায়নবাদী ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে মুসলিম জনমত ও সংবেদনশীলতা তৈরির জন্য গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করেছে। আমরা সবাই ট্রাম্পের এই উক্তি শুনেছি— "সৌদি না থাকলে ইসরাইল মহাসঙ্কটে পড়ে যেত"। বিগত বছরগুলোতে সংঘটিত গোপন কার্যক্রম এবং রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনেক পরিকল্পনার কথাই আজ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। পরিসংখ্যান নয় বরং কেবল উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, মিডল ইস্ট মনিটর এবং মিডল ইস্ট আই-এর ওয়েবসাইট দুটি যে তথ্য ফাঁস করেছে তাতে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ আল-ওতাইবা এবং মার্কিন কূটনীতিক ডেনিস রস এর মাঝে পত্র আদান প্রদানের মতো বিষয় রয়েছে। চিঠি থেকে জানা গেছে, ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে সংযুক্ত আরব আমিরাত উদগ্রীব।

এমন আরও অনেক গোপন তথ্যের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ বিন সালমানের গোপনে তেল আবিব সফর। এমনিভাবে আবুধাবি ও তেল আবিবের মাঝে বিশেষ বিমান রুট থাকার মতো বিষয়। ফাঁস হওয়া তথ্যের মধ্যে আরও রয়েছে, কোচাবি'র মালিকানাধীন একটি কোম্পানি ও আবুধাবির মাঝে সম্পাদিত বাণিজ্যিক চুক্তি। এই চুক্তি ছিল - পর্যবেক্ষণ ও তদন্তের নানান সাজ-সরঞ্জাম

এবং পেট্রোল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের বিষয়ে । উইকিলিকস ওয়েবসাইটে যে তথ্যগুলো এসেছে, সেখানে দেখা গেছে, ইহুদীবাদীদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে সৌদি সরকারের আগ্রহ তুঙ্গে। নির্ভরযোগ্য এক সূত্রের মাধ্যমে সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি পত্রের কথা জানা যায় । একটি পত্রে এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে—"সৌদি নিরাপত্তা জোরদারকরণ এবং সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"। লিখেছে নায়েফ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল আজিজ। মার্কিন সম্মিলিত বাহিনীর একটি ছোট দলের ব্যাপারে সে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়।

প্রবন্ধটিতে নায়েফ ইহুদীবাদীদের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে এবং রিয়াদ ও তেল আবিবের মাঝে সম্পর্ক জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। "সৌদি আরবের ক্ষেত্রে ইসরাইল শত্রু থেকে বন্ধুতে রূপান্তরিত হতে পারে"- শিরোনামে একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ ওই পত্রে সংযুক্ত ছিল। সেটা লিখেছিল আমির আউরিন। হারেটেজ পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হয়। এই প্রবন্ধটি মূলত নায়েফ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল আজিজ রচিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধের ওপর মন্তব্য স্বরূপ। তাতে বলা হয়েছে - "মার্কিন সামরিক ম্যাগাজিন জয়েন্ট ফর্সেস কোয়ার্টারলি বা জে এফ কিউ-তে প্রকাশিত পদস্থ একজন সৌদি আমিরের প্রবন্ধের মাধ্যমে ইসরাইলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী পত্রটির পেছনের বক্তব্য হচ্ছে বক্ষ্যমাণ এই প্রবন্ধ"।

সৌদি রাজ পরিবারের একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার জোর দিয়ে বলেছেন যে, সরকারি গভর্নরদের অবস্থান পরিষ্কার করার ক্ষমতা তার নেই। এবং তিনি আশ্বস্ত করার জন্য হলেও এ বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করছেন না। অথচ পুরো ব্যাপারটি খোলাসা হওয়া কূটনৈতিক বিচারে অতি-গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বোঝা যাচ্ছে, দিনশেষে সৌদি আরবও ইসরাইলের সঙ্গে প্রেমালাপে লিপ্ত তবে সেটা কিছুটা দ্বিধা সঙ্কোচ সহকারে এবং শর্ত সাপেক্ষে। প্রবন্ধে আরো এসেছে: "এ পর্যায়ে এসে তার (ইসরাইলের) অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে যায়"। কারণ তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছেন, ইসরাইল এবং সৌদি আরব—উভয় রাষ্ট্রই তৃতীয় একটি দেশের শত্রুতায় অংশীদার আর তা হচ্ছে ইরান। একইভাবে উভয় রাষ্ট্রই আরো একটি দেশের সমর্থন লাভের দিক থেকে অংশীদার আর তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। অতএব এই দুই রাষ্ট্রের মাঝে দরকার 'দ্বিপাক্ষিক আলোচনা'। নায়েফ প্রমুখ সামরিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় তা যেভাবেই শুরু হোক না কেন - সে আলোচনার উদ্দেশ্য হবে, উভয় রাষ্ট্রই যেন এতদঞ্চলে কূটনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট এবং সোচ্চার থাকে"।

'দ্য নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন' তার এক প্রতিবেদনে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে আমিরাত সরকার বিশেষ করে মুহাম্মদ ইবনে জায়েদের সঙ্গে ইসরাইলের শক্তিশালী গোপন সম্পর্কের তথ্য ফাঁস করেছে। এই হল ফাঁস হওয়া কিছু বিষয়। নয়ত আরো কত কিছু যে গোপন রয়েছে সেটা বলা মুশকিল। সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের একটি নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে। আর তা হচ্ছে জায়নবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ করা। এখন শুরু হয়ে যাবে সরকারি পত্র পত্রিকা, স্যাটেলাইট চ্যানেল এবং ইহুদীবাদীদের গুপ্ত অনুচর, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী লেখক কর্তৃক ইসরাইল প্রশ্নে ইতিবাচক মূল্যায়ন। তারা ইসরাইলের সাথে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপনের গুরুদায়িত্ব পালন করা শুরু করেছে। তবে, এটা হবে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে, সতর্কতার সঙ্গে; আবার না গণবিপ্লব আরম্ভ হয়ে যায়—এই ভয়ে ভয়ে। কারণ আল্লাহর ইচ্ছায় আসন্ন ইসলামী বসন্তের দুঃস্বপ্ন তাদের ঘুম দূর করে দিয়েছে এবং জীবন বিষিয়ে তুলেছে। উইকিলিকস আবুধাবির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমেরিকানদেরকে উদ্দেশ্য করে মোহাম্মদ বিন জায়েদের এই উক্তির কথা জানা গেছে— "আমিরাতের অধিবাসীরা যদি জানত আমি কী করছি, তবে তারা আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করত"। সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সৌদির মজলিশে শূরা প্রধানের একটি বিবৃতি, যেখানে তিনি আরবের সংসদ সভাগুলোর কথাবার্তার সমালোচনা করেছেন

এবং ইজরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া স্থগিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার দাবি তুলেছেন। একইসঙ্গে কান্না ও হাসির বিষয় হচ্ছে, তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন - এ জাতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়াটা শুধুমাত্র রাজনৈতিকদের একার অধিকার, পার্লামেন্ট সদস্যদের নাকি এখানে হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

কি আশ্চর্য! তাদের মাঝে পার্থক্যের কি হলো! এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, আরব সরকার বিশেষ করে সৌদি এবং আমিরাতের নেতৃবৃন্দের সামনে প্রতিনিয়ত গাদ্দাফির সেই চিত্র মূর্ত হয়ে উঠছে, যখন তাকে হত্যা করা হচ্ছিল। তারা যখন নিজেদেরকে গাদ্দাফির স্থলে কল্পনা করে, তখন ভয়ে তারা কাঁপতে থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের এই দুঃস্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে। তাদের ভয় যখন বেড়ে যায়, ভীতি যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন তাঁরা মৃদু কিছু অভিযোগ নিয়ে সরব হয়। উদাহরণস্বরূপ: "ফিলিস্তিনিদের পরাজয় সূচক অবস্থান রেখে ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি সম্পন্ন হতে পারে না"। এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সালমানের উক্তি —"জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত একটি দুঃখজনক পদক্ষেপ"। এদিকে ইসরাইল এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের ভিত্তিতে তারা যে রাজনীতি করছে সেদিকে কোনো ইঙ্গিতই নেই। এ তো গেল পর্দার বাইরের কথা। অতি দ্রুত নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ সুগম করার জন্য এই উভয় মুরতাদ সরকার সম্প্রতি ইহুদীবাদী সংঘ ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে পর্দার অন্তরালেও পাকাপাকিভাবে ঘনিষ্ঠতা গড়েছে। প্রথমেই তারা কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

১. নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের প্রতি মুসলিমদের লালিত শত্রুতার মনোভাবকে দুর্বল করে দেওয়া। বরং আরো এক ধাপ এগিয়ে ইসরাইল সম্পর্কে ইতিবাচক মূল্যায়ন উপস্থাপন, মুসলিম ব্রাদারহুড আন্দোলনের ব্যাপারে বিরুদ্ধ জনমত তৈরি, তাদেরকেই স্বদেশের প্রধান শত্রু হিসেবে চিত্রায়ন, এতদঞ্চলে রাফেজী আগ্রাসনের প্রতিরোধে তাদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখিয়ে জনমনে ইসরাইলের সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উস্কে দেওয়া—এ সবই তাদের প্রথম পদক্ষেপের শামিল। অথচ শিয়া-রাফেজী প্রশ্নে বাস্তবতা হলো, আহলে সুন্নাহ্'র রক্তপাত সমর্থনে প্রথম সারিতে রয়েছে সৌদি আরব। আর ইরানের সঙ্গে আমিরাতের শক্তিশালী বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা কারো অজানা নয়। রাফেজী প্রতিরোধে এই কী তাদের ভূমিকা? একইভাবে কাতার সরকারও ইহুদীকরণের প্রতিযোগিতায় তাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাতার রাজনৈতিক সমস্যা দিয়ে মানুষকে ব্যস্ত রাখছে। এরপর ধীর স্থিরভাবে জায়নবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও ইহুদীকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য - বারবার একই বিষয়ে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করে চলেছে।

২. মুসলিমদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে সে অর্থ দস্যু ট্রাম্পের নিরাপত্তা বিধান ও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। এভাবে কথিত 'ওয়ার অন টেরর' বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার ধ্বস-নামা অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ তাদেরই জানা নেই, সন্ত্রাসীরা কবে পরাজিত হবে? এটাও জানা নেই তাদেরকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যটাই বা কী? যেমন বব উডওয়ার্ড রচিত "ওবামা'স ওয়ারস" গ্রন্থে গেটসের এই উক্তি; "আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি তা সম্পূর্ণ সঠিক। আমাদের এই লক্ষ্য নির্ধারণ সুদূর পরিকল্পনা প্রসূত। তালেবানের পরাজয়কে লক্ষ্য বানিয়ে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত আছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তালেবানকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যটা কী?"

যাইহোক, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আরব সরকার কর্তৃক মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন বিগত দশ বছর ধরে চলে আসছে। এক্ষেত্রে তারা এই নীতি গ্রহণ করেছে— 'বেশিটা এড়াতে অল্পতেই রাজি হয়ে যাও'। এর ভিত্তিতে তারা স্বল্প অঙ্কের কিছু অন্যায় ট্যাক্স বসিয়েছে এবং পণ্যের দাম বৃদ্ধি করেছে। এর দ্বারা তারা মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে যে, এসব ছোটখাটো অন্যায় আজকাল স্বাভাবিক।

এসব কূটকৌশলের মাধ্যমে তারা চলতে থাকা ভয়ানক এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে আড়াল করেছে। আর সমাজের বড় অংশই এই কূটকৌশল ও প্রতারণার শিকার হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ট্রাম্পকে তারা এত পরিমাণ অর্থ দিয়েছে, কেজির বাটখারাতেই যার পরিমাপ চলে। এমনকি ট্রাম্প তার এক বক্তব্যে বলেছে, "অর্থের মতো অন্য কোনো কিছু সৌদির নেই"। ট্রাম্পের এই বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, অর্থ ছাড়া সৌদি সরকার একটি খরগোশের চেয়েও দুর্বল।

৩. গান-বাদ্যের অনুষ্ঠান ও অশ্লীল বিনোদনের আয়োজন করে মুসলিমদেরকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়া। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা যদি চিন্তা করত, যে অর্থ ব্যয় করে এগুলোর আয়োজন করা হচ্ছে সেগুলো যদি তাদেরই জন্য ব্যয় করা হতো, তবে তাদের জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত হতো, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত এবং বাণিজ্যের বাজারে তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত! কিন্তু বাস্তবতা হলো, নির্বোধদের যারা চিকিৎসা করবে, বোকামি আজ তাদেরকেই পেয়ে বসেছে। এদিকে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুচক্রীমহল এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করছে; একদিকে জনসাধারণকে অনৈতিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে আবার এসকল গান-বাদ্যের অনুষ্ঠান ও বেহায়াপনার আয়োজনে তাদের কাছ থেকেই অর্থ আদায় করছে।

৪. (জায়নবাদীদের সঙ্গে) সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ইস্যুতে যারা সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির বিরোধিতা করে কিংবা অন্ততপক্ষে সমর্থন না জানিয়ে নীরব থাকে, তাদেরকে জেলে বন্দি করা। তারা এখানেই থেমে থাকেনি, বরং আরো দূর অগ্রসর হয়ে তাদেরই আসন সুদৃঢ়কারী শুভানুধ্যায়ীদেরকে বন্দী করেছে, যারা এক সময় মানুষকে এই মিথ্যা আশ্বাস বাণী শোনাতেন, "এ সরকার না থাকলে উঁচু-নিচু সব জায়গা থেকে ফেতনা ধেয়ে আসত। এ রাষ্ট্রের সরদারগণ জনগণের কল্যাণকামী"। সে সময় তাদের জানা ছিল না, এ সরকারই সকল অনিষ্টের মূল। সকল ফেতনা ও অনর্থের উৎস। সরকার তাদেরকে মুজাহিদদের বিরোধিতায় পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। অবশেষে যখন দেখেছে, তাদের আর প্রয়োজন নেই, তখন বন্দিশালায় নিক্ষেপ করেছে। ওপরে তো কেবল সরকারের সমর্থক গোষ্ঠীর কথা বলেছি। এর বাইরে আরও বহু ওলামা এবং তালেবে এলেমকে বন্দি করা হয়েছে, দ্বীনি খেদমতে যাদের রয়েছে পূর্বদৃষ্টান্ত ও অগ্রণী ভূমিকা । এখানেই শেষ নয়! তারা আরো যে কতকিছু করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখানে শুধু এতটুকু বলি, খাশোগি হত্যাকাণ্ড কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি। অপরাধের এত দীর্ঘ ফিরিস্তি সত্ত্বেও একদল এখনো তাদের ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ না করে পারে না!!

৫. খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ, তাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন ও হিন্দুদের জন্য মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুসলিমদের 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা ' নামক চিরাচরিত আকিদার বিলোপ সাধন। নানান জাতি, ধর্ম ও মতাদর্শের লোকদেরকে একীভূতকরণ। এই সবকিছুই করা হচ্ছে আরব উপদ্বীপে মুসলিমদেরকে শক্তিহীন দুর্বল করার জন্য, এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যায় কাফির, মুশরিকদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

এসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা ও প্রতিরোধের দায়িত্বভার সাধারণভাবে সকল মুসলিমের এবং বিশেষভাবে আহলে এলেম শ্রেণীর কাঁধে ন্যস্ত।

৬. আরব বসন্তের বিপরীত বিপ্লবে সমর্থন দান। মিশর, লিবিয়া ও ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে মুসলিমদেরকে নিধন করার জন্য এবং চোর-ডাকাত নিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার অনুগত বানানোর জন্য ঘাতকদেরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে মুসলিম দেশগুলোতে সঙ্কট জিইয়ে রাখা।
অবস্থা খুবই খারাপ। এ সমস্ত সরকার খোদ ইহুদীদের অপেক্ষা অধিক ইহুদীবাদী। তাদেরকে অপসারণ করার জন্য কাজ করা শরীয়ত নির্দেশিত দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না।

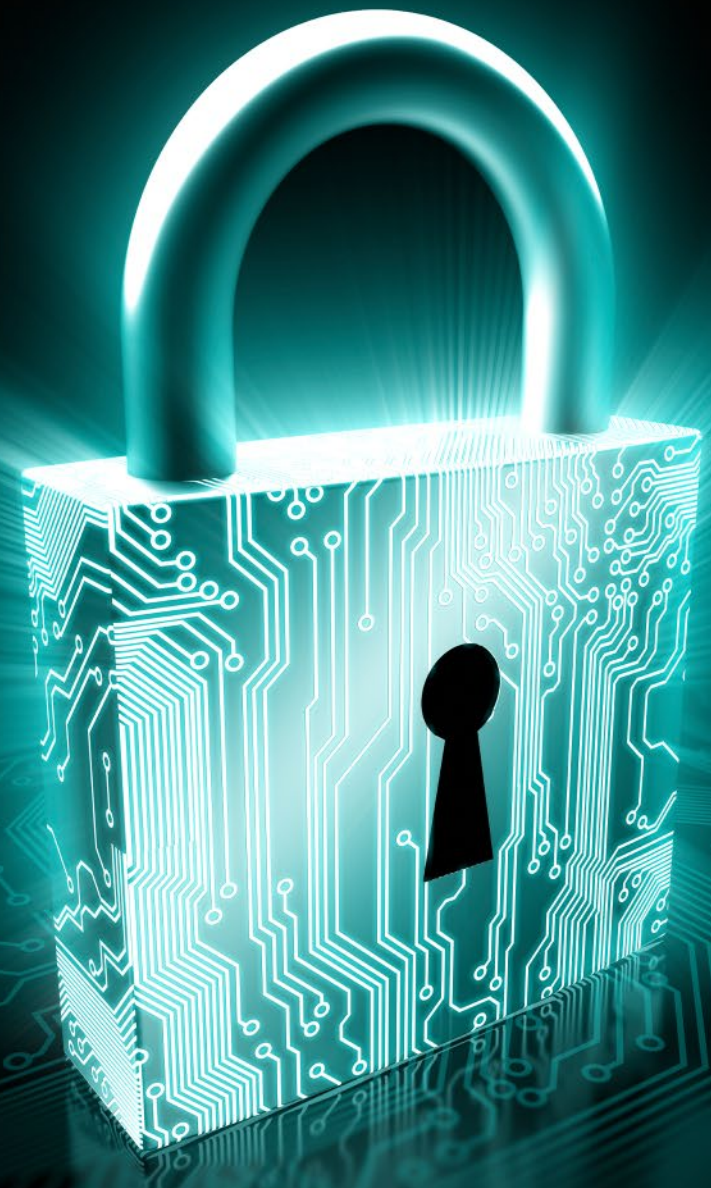

নিরাপত্তা ও দায়িত্ববোধ

মুখতার

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেন,

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُون

'এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে'। [সুরা সাফফাত ৩৭: ২৪]

ইমাম আলুসি বলেন, 'এই আয়াতের ব্যাপারে বলা হয়েছে - এতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রতিটি স্থান অতিক্রমকারীকে সে স্থান সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার জন্য থামতে হবে। ঐ স্থান সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে যদি সদুত্তর দিতে পারে, তবে তাকে সামনে চলার অনুমতি দেওয়া হবে। অন্যথায় দায়িত্ব পালনের আগ পর্যন্ত নিজ অবস্থায় তাকে আটকা পড়ে থাকতে হবে'। তাফসীরে ইবনে কাসীরে এসেছে - এই আয়াত এবং এজাতীয় আরো যেসব আয়াত দায়িত্ববোধের অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বোঝা যায়, দায়িত্বজ্ঞান ও অনুভূতি বিদ্যমান থাকা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ। এটি রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালার সামনে দণ্ডায়মান হবার দিন, মুক্তি লাভের একটি মজবুত ভিত্তি হবে। হাবিবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব অনুভবের অনুশীলন করিয়েছেন।

তাই তো আমরা দেখতে পাই, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ ঘরের লোকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারীর দায়িত্ব স্বামীর ঘরের লোকদের ব্যাপারে; তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। ক্রীতদাস মনিবের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব হুঁশিয়ার! তোমরা প্রত্যেকেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"। সুহৃদ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিরাপত্তার সম্পর্ক কী? এর জবাবে আল্লাহর তাওফিকে আমরা বলব - দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিরাপত্তার সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, জিহাদি আন্দোলনগুলো ইতিপূর্বে যতগুলো নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে, তার পেছনে সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো মুজাহিদদের একটি অংশের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। মুসলিমদের নিকট অতীতের ইতিহাস, যার ব্যাপ্তি প্রায় দুই দশক, তাতে নিরাপত্তামূলক যুদ্ধে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। এটি স্পষ্ট বিষয় যে, সাধারণভাবে সামষ্টিক কার্যক্রম এবং বিশেষভাবে জিহাদী কার্যক্রম হচ্ছে - শক্তি ও দুর্বলতার ভারসাম্য রক্ষা করে পারস্পরিক সাহায্য ও একতার ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল সুবিন্যস্ত কিছু পদক্ষেপ। এই পুরো চেইনের ভেতরে ছোট একটি অংশের মাঝে থাকা ত্রুটিও বাকি সব অংশের ওপর এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমরা একটি সরল দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই। এতে আসল চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে ইনশাআল্লাহ। ধরে নেই, নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে একদল মুজাহিদ কাজ করেন। নানা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা নিয়োজিত আছেন। তাদের মাঝে প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট পরিষদ কর্তৃক প্রণীত জরুরী নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিগুলো পুরোপুরি অনুসরণ করে চলেন।

বলাবাহুল্য, সেসব নীতি অনুসরণযোগ্য ও বাস্তবায়িত করার জন্য অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদদের প্রাণের নিরাপত্তা এবং জিহাদী কার্যক্রমের চলমানতা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই দলের ভেতরে এমন একজন সদস্য রয়েছে, যার মাঝে দায়িত্ববোধ নেই। নিরাপত্তার মূলনীতিগুলো লঙ্ঘন করতে সে পরোয়া করে না। অধিকাংশ সময় সে একটি মূলনীতিরও তোয়াক্কা করেনা। সে এমন এমন পন্থায় নিয়ম অমান্য করে যা মুজাহিদরা কখনও কল্পনাও করেনি। এদিকে শত্রু তার জনবল, বস্তুতান্ত্রিক উপায়-উপকরণ ও টেকনোলজি ব্যবহার করে মুজাহিদদের জন্য ওঁত পেতে আছে। মুজাহিদদের ক্ষতি সাধনের জন্য, তাদের কার্যক্রম থামিয়ে দেওয়ার জন্য, এমনকি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য; যেকোনো প্রকার সুযোগের তারা সন্ধান করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ শূন্য ওই সদস্য এবং এ জাতীয় অন্যান্যরা যেন শত্রুর জন্য হারানো মানিক। একজন মুজাহিদ ও রিবাতের আমল পালনকারী হওয়া সত্ত্বেও এই সদস্য শত্রুর জন্য মোক্ষম একটি স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র।

শত্রু তাকে সুরক্ষা দিয়ে তার দ্বারা সর্বোচ্চ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। সদস্যটি তখন শত্রুর হোয়াইট লিস্টে স্থান পায়। আর সেই লিস্টে নাম থাকা অন্যান্যদের মতোই ওই সদস্যকে টার্গেটে পরিণত করা শত্রুর কাছে নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এর কারণ হলো, এজাতীয় লোকগুলো শত্রুপক্ষকে এমন অসংখ্য অগণিত সেবা দিয়ে যাচ্ছে, শত্রু যা লাভ করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। সুপ্রিয় পাঠক! এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উপরের দৃষ্টান্তটি নিতান্তই কাল্পনিক। বরং এগুলো এমন বাস্তব ঘটনা যা বহুবার ঘটেছে এবং আজও ঘটে চলেছে। সেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা ক্ষণজন্মা বহু নেতা ও শ্রেষ্ঠ সৈনিককে হারিয়েছি, যাদের কথা মনে হলেই অন্তর ব্যথিত হয়ে যায়। এগুলোর কারণে অসংখ্য সৃজনশীল নির্মাণ ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে; যেগুলোর পেছনে অনেক শ্রম ব্যয় হয়েছিল। অনেক ঘাম ঝরিয়ে যেসব কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল, এসব ঘটনায় এমন অনেক কাঠামো ধসে গেছে। যদি বলি, বহু ক্ষেত্রে এসব ঘটনার কারণে বিজয় বিলম্বিত হয়েছে, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এ পর্যায়ে পাঠকদের জন্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। বছর দশেক পূর্বে শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর কাছে পত্রটি প্রেরণ করা হয়। সেখানে আমাদের এই আলোচ্য বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাতে বলা হয়েছে "দায়িত্বের অনুভূতি না থাকাটা মুজাহিদকে, এমনকি শত্রুদের গুপ্তচরের চাইতেও ভয়ংকর চরিত্রে পরিণত করে। যেমনটা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং বিষয়টি কারো অজানা নয়। গুপ্তচরবৃত্তিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তথ্যের সমাবেশ ঘটানো। আর অত্র অঞ্চলে এমন এক তথ্য ভাণ্ডার রয়েছে যা কখনো শেষ হবার নয়। উপরোক্ত তথ্য ভাণ্ডার থেকে শত্রু অব্যাহতভাবে উপকৃত হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে ওয়াজিরিস্তান অঞ্চল থেকে ফোনে অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যে বাহিরে যোগাযোগ।

এর চাইতে ভয়ানক বিষয় হলো, ময়দানে এমন কিছু সাথী রয়েছেন, যাদের সঙ্গে কাজ করা খুবই কঠিন। ফোনে অথবা ইন্টারনেটে কোনো কথা বলতে তারা ভয় পান না। যদি আমি বলি, এসব সাথী কখনো কখনো এমনকি গোয়েন্দাদের চাইতেও ভয়ানক চরিত্রে পরিণত হন; তবে এটা অত্যুক্তি হবে না। যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসতর্কতাকে যদিও অনেকেই টার্গেট বোম্বিংয়ের কার্যকারণ মনে করেন না, কিন্তু জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি, আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার পর এখন পর্যন্ত আমাদের নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার পেছনে এটাই প্রধান কারণ"। দায়িত্বের অনুভূতি না থাকা, উদাসীনতা ও বেপরোয়াভাব - জিহাদী আন্দোলনগুলোর টিকে থাকার পক্ষে এক বিরাট ঝুঁকি। আধুনিক জাহিলিয়াতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ানো ইসলামী দলগুলোর পতনের অন্যতম কারণ হলো এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। এতে করে বহু বছরের শ্রম, পরিশ্রম, কষ্ট ও রক্ত-ঘামের অপচয় ঘটে। অতএব, এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। বিষয়টি কোনমতেই অবহেলার নয়। বিজ্ঞ মুজাহিদ নেতৃবৃন্দের জন্য উচিত হলো, এই মরণব্যাধির প্রতিকারের জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এই বিষয়ে এগিয়ে আসা। আর তাই শরীয়তসম্মত সকল পন্থায় এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিজাত সকল উপায় প্রয়োগ করে দায়িত্বজ্ঞানহীন সদস্যদেরকে নিবৃত্ত করা তাঁদের কর্তব্য। যদি এমন না করা হয় তবে তরী সকলকে নিয়ে ডুবে যাবে।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি হাদিস সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, "আবু নু'আইম আমাদের কাছে যাকারিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমেরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘনকারী এবং তা লঙ্ঘিত হতে দেখেও নিঃস্পৃহতা অবলম্বনকারী, এই দুই ব্যক্তির উদাহরণ হলো- যেমন একদল লোক জাহাজে অবস্থানের ব্যাপারে লটারি করল। তাদের কতক লোক জাহাজের উপর তলায় আর কতক লোক নিচতলায় স্থান পেল। নীচতলার লোকেরা পানির জন্য উপরতলার লোকদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করত। তখন নিচতলার লোকেরা চিন্তা করল, আমরা যদি আমাদের এখানে একটি ছিদ্র করে ফেলি তাহলে উপরতলার লোকেরা আর বিরক্ত হবে না। এই অবস্থায় উপর তলার লোকেরা যদি নিচতলার লোকদেরকে বাধা না দেয়; বরং তাদের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয় তবে জাহাজের সকলেই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা বাধা প্রদান করে তবে জাহাজের সকলেই বেঁচে যাবে'।

প্রথম পর্ব

ধ্বংসের মুখে আমেরিকান অর্থনীতি

মুহসিন রুমী

সম্প্রতি 'সিএনএন' মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জে ১৯৮১ থেকে বর্তমান ২০১৯ সাল পর্যন্ত শেয়ার ও বন্ড মূল্যের উন্নতি নিয়ে একটি 'অর্থনৈতিক সারসংক্ষেপ' প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল, 'রিগ্যান থেকে ট্রাম্প; প্রেসিডেন্টদের শাসনামলে শেয়ার বাজারের স্বরূপ'। আমরা এই প্রবন্ধে সেই প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ ।

প্রতিবেদনটির শুরুতে প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের শাসনামলে শেয়ার মূল্যের উন্নতির একটি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন বিন্যস্ত করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান থেকে শুরু করে প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের শাসনামলের আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ দিয়ে। তা ছিল এই-

রিগ্যানের শাসনামল:

এ সময় আমেরিকান শেয়ার সূচক ১১৮% এ উন্নীত হয়। শেয়ার সূচকের এই উন্নতির কারণ ছিল - সামরিক খাতের অধিক ব্যয় সামাল দেবার জন্য ট্যাক্স কমানো এবং সুদের হার বৃদ্ধি করা। যার টার্গেট ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানো। রিগ্যান এক্ষেত্রে সফলও হয়েছিল।

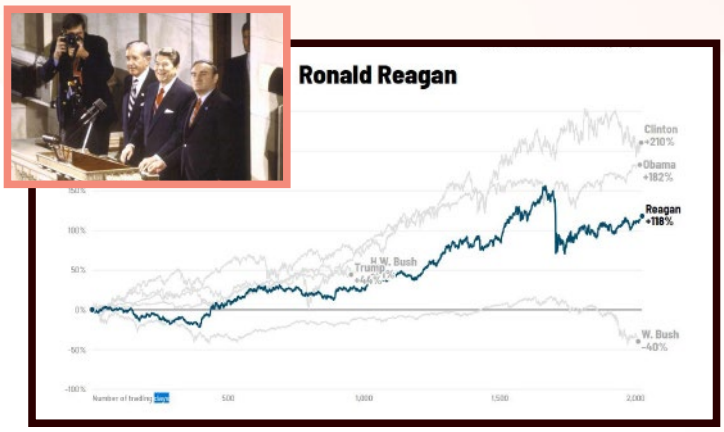

বুশ (সিনিয়র) এর শাসনামল:

বুশ (সিনিয়র) মাত্র একবার ক্ষমতায় ছিল। সে সময় আমেরিকান শেয়ার সূচক ৫০% এ উন্নীত হয়। এটা হয়েছিল সঞ্চয় সংকট, ঋণ ও উপসাগরীয় যুদ্ধগুলোর কারণে। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের ফলে পেট্রোলের মূল্য দিগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকান অর্থনীতির উন্নতির ধীরগতির কারণেই বুশ (সিনিয়র) দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হয়। তার উপর বিজয়ী হয়ে যায় ক্লিনটন।

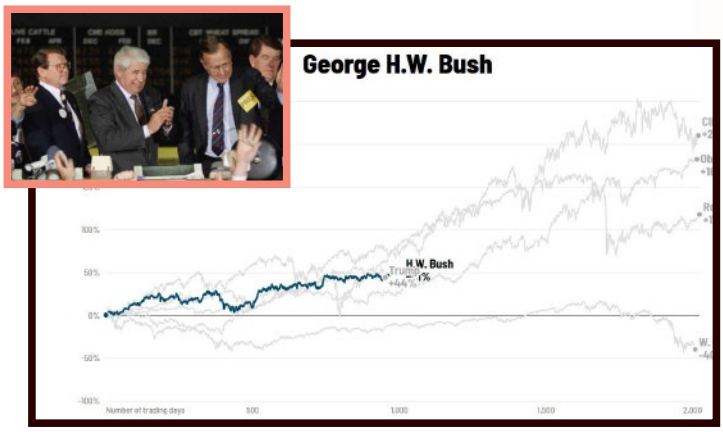

ক্লিনটনের শাসনামল:

ক্লিনটনের শাসনামলে আমেরিকান শেয়ার সূচক ২১০% এ উন্নীত হয়। এ বিশাল প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান কারণ ছিল ইন্টারনেট ভিত্তিক অর্থনীতির উত্থান ও দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি। এ সময় আমেরিকা তার আধুনিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক দীর্ঘ ধাপ উপভোগ করে। যার ফলে দেশীয় উৎপাদন ৪% ছাড়িয়ে যায় এবং বেকারত্বের হার ৪% এ নেমে আসে। তেমনিভাবে 'ন্যাসড্যাক ' সূচকও ১৯৯৩ ও ২০০০ সালের মাঝামাঝিতে সাত গুণ উন্নতি লাভ করে। এ অবিশ্বাস্য প্রবৃদ্ধির ফলে ব্যাপক সমৃদ্ধি অর্জন হয়। যদিও এই সমৃদ্ধির ভিত্তিমূল শক্ত নয়। যার ফলে এর অনেকগুলো অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

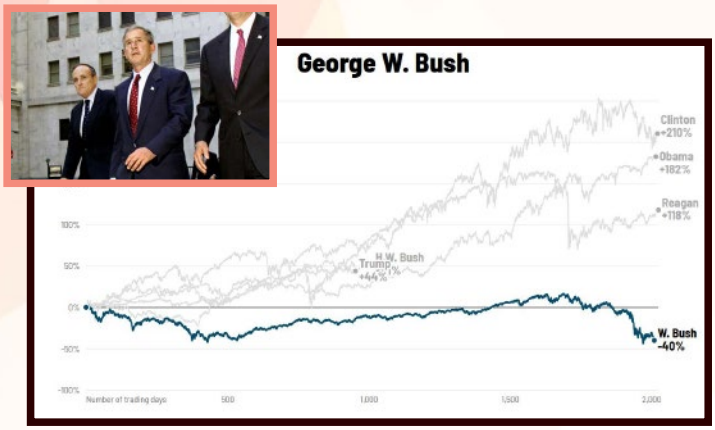

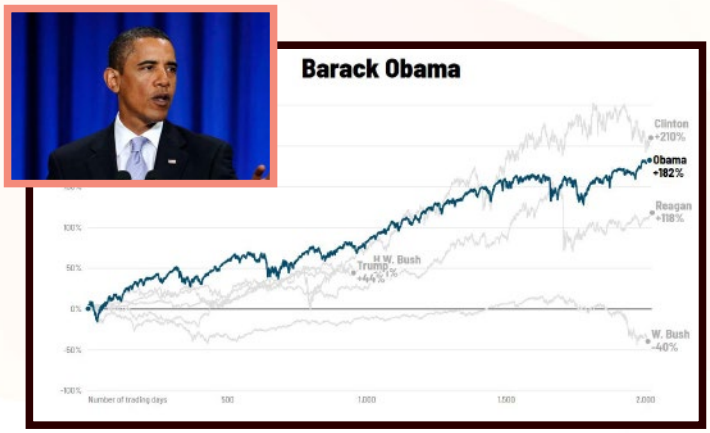

জর্জ ডব্লিউ বুশের (জুনিয়র) শাসনামল:

বিনিয়োগকারীরা বিরাট আশা রাখত কীর্তিমান পুরুষ জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রতি! তারা ধারণা করেছিল খুব শীঘ্রই সে আমেরিকান অর্থনীতিকে আপন শক্তিতে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তাদেরকে নিদারুণ আশাহত হতে হল। কারণ তার শাসনামলেই আমেরিকান শেয়ার সূচক চলমান শতাব্দীর আমেরিকান সরকারের ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক পতনের মুখ দেখল। শেয়ার সূচক ৪০% এর নিচে নেমে আসলো। কারণ বুশ ইন্টারনেট শিল্পের অসাড় ফলগুলোর উত্তরাধিকার লাভ করেছিল, যার কারণে ২০০১ সালে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ১১-ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটল। যা এই পতনকে আরও গভীরতর করল।

তবে বুশ, ২০০৪ ও ২০০৫ সালে প্রবৃদ্ধি শক্তি অর্জন করেছিল। যার কারণ ছিল আংশিকভাবে কম সুদের হার এবং আবাসন শিল্পের উত্থান। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্তন হল। এর কারণে প্রজন্মের সেরা অর্থনৈতিক ট্র্যাজেডি ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হল। বুশের চার বছর শাসনামলের শেষ বছরে দেশীয় সামগ্রিক উৎপাদন বাৎসরিক হার হিসাবে ৮.৪% এ নেমে আসল। দ্রুত বেকারত্ব বাড়তে লাগল। ২০০৮ সালে আমেরিকান শেয়ার সূচক ৩৮% নিচে নেমে আসল। মহা মন্দার সময় গুলোর মধ্যে এ বছরই ছিল সবচেয়ে খারাপ বছর।

ওবামার শাসনামল:

ওবামার শাসনামলের প্রথম কয়েক মাস 'ভোল স্টেট' এর পতন অব্যাহত ছিল। আর্থিক শিল্প ও যন্ত্রশিল্প একেবারে ধ্বংসের কিনারায় এসে উপনীত হয়েছিল, যতক্ষণ না উত্তরণের কতগুলো সরকারী পদক্ষেপ তাকে উদ্ধার করল। ২০০৯ সালে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ মাত্রায় গিয়ে ১০% এ পৌঁছল।

মার্চ ২০০৯ এ শেয়ার বাজার সর্বনিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু তারপর অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভালো হতে লাগল এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে চলতে লাগল, যা অচিরেই আমেরিকান ইতিহাসে দীর্ঘ ঊর্ধ্বগামী অর্থ বাজারে পরিণত হবে। ভয়ংকর অচলাবস্থার গভীর থেকে উঠার পদক্ষেপগুলো ছিল দীর্ঘ ও মন্থর গতির। কারণ ওবামার শাসনামলে দেশীয় সামগ্রিক উৎপাদন বছরে ৩% কে অতিক্রম করতে পারেনি।

অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করার আশায় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অর্থব্যবস্থায় সহজ অর্থসমূহকে তরল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে, যা আমেরিকান শেয়ার সূচককে তিনগুণ উঠে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু এর সাথে সাথেই এটি আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে সম্পদের সম-বণ্টন নিশ্চিত করা ব্যাহত করে।

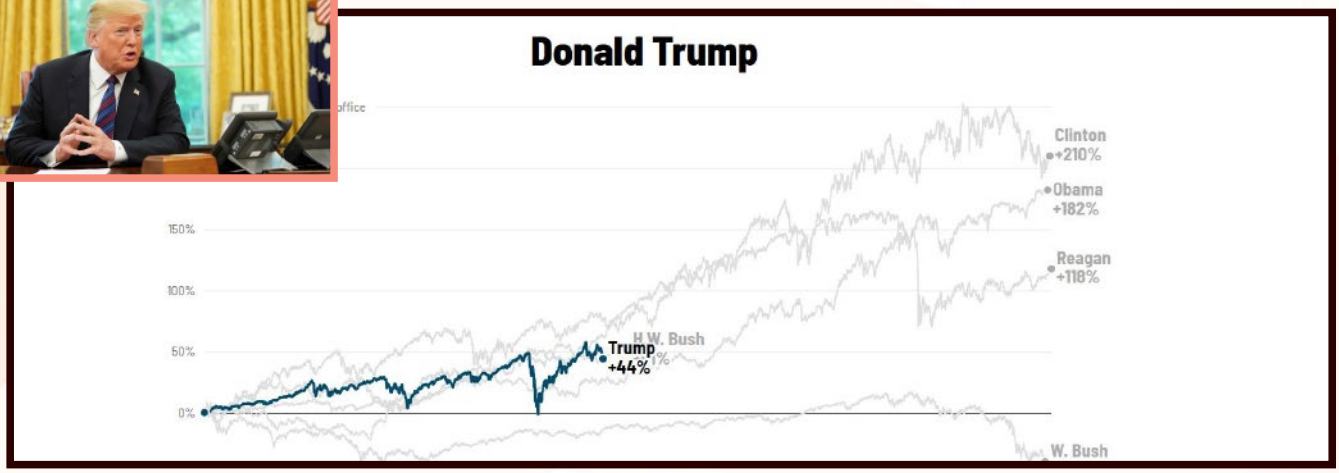

ট্রাম্পের শাসনামল:

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ে শেয়ারবাজারে তীব্র উত্থান ঘটেছিল। কারণ শুল্ক হ্রাস, প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-নিষেধ দূরীকরণ ও ভৌত অবকাঠামোতে ব্যয়ের বিশেষ কাজসমূহের জন্য পরিচালিত বিলিয়নিয়ার প্ল্যানটি 'ডাউ জোন্স' সূচককে অনেক ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে ২০১৬ সালে নির্বাচনের দিন তা ১৮,৩৩২ পয়েন্ট ছিল, সেখানে ২০১৭ সালের মার্চ নাগাদ তা ২১,০০০ পয়েন্টে উন্নীত হয়। প্রবৃদ্ধি ৪% এর চেয়েও অধিক হয়ে গেল এবং তা দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। শেয়ারমূল্য বেড়ে গেল এবং বেকারত্বের হার ৩.৭% এ নেমে আসলো। কিন্তু ট্রাম্পেরই প্রজ্বলিত বাণিজ্য যুদ্ধের ফলে ও শুল্ক হ্রাসের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে তার অর্থনৈতিক যুদ্ধ; শক্তি হারালো এবং ২০১৮ সালে আমেরিকান শেয়ার সূচক দশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা প্রত্যক্ষ করল।

'সি এন এন' এর প্রবন্ধে উঠে আসা এই বিবরণের পর আমরা বলতে পারি, আমরা শুরুতে যে চিত্র লিখন দিয়ে এই প্রবন্ধ শুরু করলাম, তার প্রতি সামান্য দৃষ্টি দিলেই অর্থনীতির ব্যাপারে বিজ্ঞ-অজ্ঞ যে কারো নিকট জর্জ ডব্লিউ বুশের শাসনামলে আমেরিকান অর্থনীতির গভীর অধঃপতনের বিষয়টি লক্ষণীয় হবে। কারণ আমেরিকান শেয়ার সূচক ৪০% নেমে আসে, যা আমেরিকার ইতিহাসে মারাত্মক ট্র্যাজেডি। আমেরিকা যে ধ্বংসাত্মক ফলাফলগুলোর সম্মুখীন হয়েছে একমাত্র আল্লাহর তাওফিকে ১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক হামলাগুলোর কারণেই তা হয়েছে। শেয়ার বাজারের এই ঘটনা তা-ই প্রমাণ করে। তাই, ক্রুসেডার আমেরিকা যে অর্থনৈতিক রক্তক্ষরণের সম্মুখীন হয়েছে, তার বড় কারণ ছিল মুসলিমদের সাথে দু'টি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। তেমনিভাবে এই চিত্র লিখন সুদৃঢ়ভাবে এটাও প্রমাণ করে যে, ৯/১১ এর পরের আমেরিকা এই বরকতময় দিনের পূর্বের আমেরিকা থেকে ভিন্ন। গত দুই দশকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, অর্থনীতি বিশ্লেষকগণ সর্বদাই ৯/১১ হামলার অর্থনৈতিক ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা মাঝে মাঝে লজ্জা ও সংকোচের সাথে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়, যা এই প্রতিবেদনে এমন কতগুলো বর্ণের মাধ্যমে উঠে এসেছে, যার পরতে পরতে ছিল বেদনা। প্রবন্ধ লেখক পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে যে, ৯/১১ এর ঘটনা আমেরিকান অর্থনৈতিক পতনকে গভীরতর করে। তাই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই।

সম্ভবত এখানে আমেরিকান কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্য জাদ গ্রেগের(Judd Gregg) বক্তব্যটি তুলে ধরা সমীচীন হবে। উক্ত বক্তব্যে সে একেবারে প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে বলেছে যে, বুশের সময়ে আমেরিকান অর্থনীতির ধ্বংসাত্মক ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ ছিল; ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও পেনসিলভানিয়া মোবারক হামলাসমূহ। তার বক্তব্যটি নিম্নরূপ:

'আমরা আসলে শুল্ক হ্রাসের কারণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি হারায়নি। আমরা তা হারিয়েছিলাম ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা ও অর্থনীতির উপর তার বিরাট প্রভাবের কারণে। আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ১১ই সেপ্টেম্বর আমাদের জাতির জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক ট্র্যাজেডি। এটি একাধিক দিক থেকে আমাদের জাতির শৃঙ্খলা ধ্বংস করে দিয়েছে। এ শৃঙ্খলা ধ্বংসের একটি বড় নিদর্শন হল, আমরা গভীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি'।

হয়ত আমার সাথে পাঠকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 'সিএনএন' এর প্রতিবেদন লেখক ও কংগ্রেস সদস্য উভয়ে ১১ই সেপ্টেম্বরের অভিযানগুলোর গভীর প্রভাবের ব্যাপারে একমত হয়েছে। যার অর্থই হল অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব! প্রবন্ধ লেখকের প্রধান লক্ষ্য ছিল ওবামার অবদানগুলো প্রচার করা এই বলে যে, তার পদক্ষেপগুলোই আমেরিকান অর্থনীতিকে গভীর দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেছে আর ট্রাম্পের অর্থনৈতিক অবদানগুলো কম করে দেখানো। এটা হল ২০২০ সালের নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রাথমিক হামলা। কিন্তু এই প্রতিবেদনটি খুব গুরুত্বের সাথে 'একটি বিষয়ে' নাম্বার ও সংখ্যা উল্লেখ করা ব্যতীত সতর্কভাবে ইঙ্গিত দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তা হল, ওবামার অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলোর জন্য রক্তচোষা মূল্য পরিশোধ করা। কারণ ওবামা প্রশাসন কয়েকটি বড় বড় কোম্পানিকে উদ্ধার করার জন্য আমেরিকান অর্থনীতিতে তারল্য হিসাবে রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রদান করেছিল।

ওবামা তার এক ভাষণে উক্ত পদক্ষেপের যথার্থতা বুঝাতে গিয়ে বলে, "আমরা এমন এক অর্থনৈতিক দুর্যোগের উত্তরাধিকারী হয়েছি, যার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। এটা এমন দুর্যোগ, যা পুঁজিবাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অর্থব্যবস্থা ও মোটরযান খাত উদ্ধারের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আমাদেরকে বাধ্য করেছে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর বিরাট পরিমাণ শেয়ারের মালিক হতে। কারণ সহজ! আমরা চাই ওই সকল কোম্পানিগুলোকে চালু রাখতে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি এগুলোর উপর নির্ভরশীল" আসলে এই ব্যবস্থাগুলোর ফলে মার্কিন ঋণের পরিমাণ ভয়ংকর ও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে আমি বিগত ত্রিশ বছরে আমেরিকান সাধারণ ঋণের ভয়ংকর বৃদ্ধির চিত্র লিখনটি প্রদান করছি। বিশেষ করে ৯/১১ এর পরে এবং ওবামার দুই সময়ের শাসনামলে,

চিত্র লিখন

চিত্র লিখনটির প্রতি স্বল্প দৃষ্টি দিলেই আপনার নিকট ৯/১১ এর পরে আমেরিকার সাধারণ ঋণ বৃদ্ধির অবস্থাটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। মার্কিন ঋণ ২০১৮ সালে ৫.৮ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ২৩ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। আর আমরা যদি ৯/১১ এর পূর্বের সাধারণ ঋণ ও এর পরের সাধারণ ঋণের তুলনা করতে চাই, তাহলে দেখতে পাব, ৯/১১ এর দশ বছর পূর্বে তা ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল, সেখানে ৯/১১ এর পরের দশ বছরে প্রায় ৯ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় চার গুণ বেশি। আর ওবামার ৮ বছরের শাসনামলেও তুলনামূলক ঊর্ধ্বগতি ছিল। কারণ তখন ঋণ ১০ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

এটাই আমেরিকান অর্থনীতির কৃত্রিম ভালো অবস্থার ব্যাখ্যা। এটা হল ঋণের বিশাল ঊর্ধ্বগতির মোকাবেলায় প্রবৃদ্ধির দৃশ্যমান অগ্রগতি। প্রকৃত অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটা দেউলিয়া অবস্থা, যা ধ্বংসাত্মক প্রকৃতি দেখানোর জন্য যেকোনো একটি ঝাঁকুনির অপেক্ষায় আছে। যেমনটা অধিকাংশ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের আশঙ্কা। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, এমনটাই যেন হয়।
নিশ্চয়ই সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা নিজের অভ্যন্তরেই ধ্বংসের উপাদান বহন করে। মুজাহিদগণের শুধু নিজেদের সামর্থ্য ব্যয় করা প্রয়োজন, যেন সুদ ও এর ভোক্তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও"।

উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সুদের কুফলের নমুনা হল – সেই অর্থব্যবস্থা বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু সমহারে ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি লাভ করে না, যার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির কল্যাণ ও সুফলগুলো সমস্ত মানবজাতির মাঝে বণ্টিত হত। বরং তা ব্যাংকগুলোর বিশাল বিশাল অফিসের নিচে বিশ্রামরত বিনিয়োগকারী ও সুদি মহাজনদের মুষ্টির ভিতরে থেকে বৃদ্ধি লাভ করে, যারা শিল্প ও ব্যবসা খাতে নির্দিষ্ট সুদের জামানতে ঋণ দিয়ে শিল্প ও ব্যবসাকে এমন নির্দিষ্ট পথে হাটতে বাধ্য করে। এই ব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য 'জনস্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণ' নয়। অথচ কথা ছিল যে, এর মাধ্যমে সকল মানুষ সুখী হবে এবং সকলের জন্য সুশৃঙ্খল কর্মসংস্থান ও নিশ্চিত জীবিকার ব্যবস্থা হবে।

এই ব্যবস্থা সকলের মানসিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কথা ছিল। বর্তমানে তার লক্ষ্য হল, সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ করা। চাই তা লাখ লাখ মানুষকে ধ্বংস করে দিক কিংবা লাখ লাখ মানুষকে বঞ্চিত করুক কিংবা লাখ লাখের জীবন নষ্ট করে দিক। এই ব্যবস্থা সমস্ত মানবজাতির জীবনে সন্দেহ, অস্থিরতা ও ভয় সৃষ্টি করে দিচ্ছে"। মহান আল্লাহ আল্লাহ সত্য বলেছেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে"।

আমরা আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই তত্ত্বের বাস্তবতা দেখছি। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ ছিলেন প্রথম স্তরের একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও কীর্তিমান পরিবারের অন্তর্গত। একারণে তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন কোন দিক থেকে আমেরিকার কাঁধে চড়া যায়। তাই তিনি আল্লাহর তাওফিকে ও নিজ সাথীদের সহযোগিতায় আমেরিকাকে তার শক্তির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি স্থানে আঘাত হানলেন। একটি হল; আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কেন্দ্র টুইন টাওয়ার।

এটি আমেরিকান অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এর মধ্যে অধিকাংশ আমেরিকান বড় বড় কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর অফিস অবস্থিত ছিল। আর দ্বিতীয় স্থানটি হল, আমেরিকান শক্তির কেন্দ্রবিন্দু পেন্টাগন। তারপর আমেরিকাকে দু'টি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে টেনে আনেন, যে দু'টির চোরাবালিতে এখনো আমেরিকা ডুবন্ত। শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন হামলাসমূহের পর সব সময় অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। নিহতের সংখ্যার প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু তার কতক সাথীর অবস্থা ছিল ভিন্ন। তারা শুধু অভিযানে নিহতের সংখ্যা জানতে চাইতেন। নিশ্চয়ই মুজাহিদগণ আমেরিকার সাথে চলমান যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই, তারা তাদের সুদৃঢ় টার্গেটের মধ্যে রাখেন আমেরিকান অর্থনীতিকে, যার মাধ্যমে আমেরিকা সারা বিশ্বে তার সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখে।

তাই এ প্রসঙ্গে আমরা সাধারণভাবে সমস্ত মুসলিমদেরকে, বিশেষত; প্রতিভাবান ও বিশেষ নির্বাচিতদেরকে আহবান জানাই, আপনারা সকলে আপন আপন স্থান থেকে নিজেদের সময় ও চিন্তা ব্যয় করে আমেরিকান অর্থনীতির নতুন নতুন ছিদ্রপথগুলো অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করুন, যা শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ সূচনা করে গেছেন, যেন তাকে পূর্ণতা দেওয়া যায়। আশা করি, আমরা আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে নতুন কিছু দিগন্ত উন্মোচন করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র তাওফিক দাতা।

চলবে ইনশা আল্লাহ..

সিরিজ গুপ্তহত্যা

ওলামায়ে উম্মত যখন লক্ষ্যস্থল, কারণ ও ফলাফল এবং সময়ের কিছু দাবি

মৌলভী সুহাইল আহমদ আল আফগানি

কোরআনে কারিমের একটি মহিমান্বিত আয়াত নিয়ে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি। সূরা আলে-ইমরানের আয়াতটি যখন-ই আমার সামনে এসেছে, তখন-ই তা আমার আবেগ অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে। আমি কল্পনার তুলিতে বাস্তব জগতের ভিত্তিতে তার শৈল্পিক চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি। 'রিব্বি'দের আলোচনা শীর্ষক আয়াতটি হলো-

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ– وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ– فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

'আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের অনুবর্তী হয়ে বহু রিব্বি জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি- শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। অতঃপর আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন'। [সূরা আলে-ইমরান,৩:১৪৬-১৪৮]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর প্রেরিত নবীদের মাঝে অনেকেই নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেক অনুসারীও হত্যার শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁরা আল্লাহর পথে এই বিপদের কারণে ভীত হয়ে যাননি এবং দুর্বলও হয়ে পড়েননি। তাঁরা হেরেও যাননি এবং নিহত হবার সময় হীনমন্যতার পরিচয়ও দেননি। কোনো প্রকার দুর্বলতা তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি; বরং তাঁরা দৃঢ়তা, সুউচ্চ মনোবল ও উৎসাহের সঙ্গে শাহাদাতের সুধা পান করেছেন। তাঁরা লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়ে পিছু হটতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেননি। তাঁরা সম্মান ও গৌরবের পাখায় ভর করে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শাহাদাত আলিঙ্গন করেছেন'। (যাদুল মাআদ: ৩/২২৫)

এই আয়াতের অংশ বিশেষের পঠন-রীতি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক কিরাত অনুযায়ী- قاتل معه ربيون আবার আরেক কিরাত অনুযায়ী- এই মতপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরাম উক্ত আয়াতের বিভিন্ন রকম অর্থ করেছেন। এক নজরে সেগুলো হচ্ছে-

'কত নবী এমন আছেন যারা যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে অনেক আল্লাহ ওয়ালা অনুসারী নিহত হয়েছেন! তাঁদের মধ্যে যারা বেঁচে গেছেন তাঁরা দৃঢ়পদ থেকেছেন। তাঁরা হেরে যাননি, ক্লান্তও হননি; বরং নিজেদের ভাইদের আদর্শের প্রতি তাঁরা অবিচল ছিলেন'।

কেউ কেউ এভাবে অর্থ করেছেন- 'কত নবী এমন রয়েছেন যারা নিজেরা সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন আর তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে অনেক আল্লাহ ওয়ালা নিহত হয়েছেন। তখন নবী নিজে এবং তাঁর অবশিষ্ট মুমিন অনুসারীরা ধৈর্য ধারণ করেছেন'।

কেউ আবার এভাবে অর্থ করেছেন- 'কত নবী এমন আছেন যারা নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের সঙ্গে থেকে কত আল্লাহ ওয়ালা যুদ্ধ করেছেন! নবীর নিহত হওয়ার সংবাদ তাঁর অনুসারীদের মাঝে প্রভাব ফেলেনি এবং তাঁরা এতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি'। আয়াতের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরে কেরামের এই মতপার্থক্য সত্ত্বেও আয়াতের নির্দেশনাগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার পর অন্তত একটি বিষয়ে তাঁরা কোন মতপার্থক্য করেননি। বিষয়টি হচ্ছে- আল্লাহওয়ালাদের সেই বিরাট দলটি অধিকহারে নবীদের বাহিনীতে এবং তাঁদের জিহাদী জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন! আল্লাহ ওয়ালাদের সেই সংখ্যা নগণ্য ছিল না; বরং তাঁরা ছিলেন বিপুল সংখ্যক। যাই হোক, এখানে রিব্বি তথা আল্লাহ ওয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মুজাহিদ ওলামা ও লড়াইকারী ফুক্বাহায়ে কেরাম।

শেষোক্ত এই মতটি পছন্দ করেছেন সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু! অভিমতটি বিশুদ্ধ সূত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মত এটিই।

এরপর আমরা তাকাতে পারি আল্লাহওয়ালাদের ঐ সব জামাতের বেঁচে যাওয়া লোকদের অবিচলতার দিকে, যারা তাঁদের নবীগণ ও সঙ্গী-সাথীদের বড় একটা অংশ নিহত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি, সংগ্রামী দলগুলোকে আদর্শের উপর টিকিয়ে রাখতে, মনোবল না হারাতে, মন থেকে ভয়-ভীতি ও হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলতে এবং ধৈর্যধারণের জন্য তাদের মনকে প্রস্তুত করতে তাঁরা কতটা অবদান রেখেছেন! নিজেদের জন্য আল্লাহর ভালবাসার বরাদ্দ নিশ্চিত করতে তাঁরা কিরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন! তাঁরা নিজেরা কিরূপে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং সবর করতে গিয়ে কোন সব দোয়া কালাম তারা পাঠ করেছেন? সেসব দোয়া কালামের মাঝে কেমন করে তাঁদের বিনয়, সদিচ্ছা, একনিষ্ঠতা ও শত্রুর ব্যাপারে নির্ভীকতা ফুটে উঠেছিল? আমরা বলতে চাই, নিঃসন্দেহে এসব ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য বিশেষ সাহায্য। আর আল্লাহর কাছে সঞ্চিত রয়েছে তাঁদের জন্য উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ওয়াদা, তিনি তাঁদেরকে নিজের পুণ্যবান অলিদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

কোরআনের আলোকে লিখিত উপরোক্ত ভূমিকার পর আমি ঈমান ও কুফরের মাঝে চলমান লড়াইয়ের বর্তমান বাস্তবতার দিকে সকলকে নিয়ে যেতে চাই। আসলে এ সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের তাৎপর্য তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টি হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর এক শ্রেণীর উলামায়ে কেরামকে টার্গেট করে সিরিজ গুপ্তহত্যা চালানো হচ্ছে, যারা সমকালীন জিহাদের একনিষ্ঠ সমর্থক। কোন লক্ষ্যে এবং কোন পন্থায় কাজগুলো করা হয়, এগুলোর কারণ ও ফলাফল কী, আর এগুলোর প্রতিকারে সময়ের দাবিগুলোই বা-কী, এ বিষয়গুলো জানার এখন সময় এসেছে। বর্তমানে লেখালেখির অঙ্গনে এবং রাজনীতি বিশ্লেষক মহলে যাদেরকেই দেখেছি আফগানিস্তানে জিহাদী আন্দোলনের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই এই সাফল্যের পেছনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তাওফিকের পর আফগানের আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব পালনের অবদান স্বীকার করেছেন। অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হামলার ধারাবাহিকতায় এতদঞ্চলে পশ্চিমাদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামরিক আগ্রাসনের মুখে আলেমগণ যেভাবে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেছেন সেটাকে তারা গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এসমস্ত আলেম যেমন আছেন আফগানিস্তানে তেমনি আছেন এর বাইরেও।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে বড় বড় যত ইসলামিক সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে, যত রকম ইসলামী জিহাদী আন্দোলনের অভ্যুদয় ঘটেছে, সবগুলোর ব্যাপারেই এটা সত্য যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দেওয়া তাওফিকের পর এ সমস্ত মুসলিম বাহিনীর প্রথম সারিতে আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামের উপস্থিতি না থাকলে কোন আন্দোলনই প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব পেত না। আলেমগণ দিকনির্দেশনা ও সঠিক পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক ক্রুসেডাররা খুব ভালোভাবেই এটি বুঝতে পেরেছে। আর ন্যায়-ইনসাফ ও ভারসাম্যের মাপকাঠিতে জিহাদী কার্যক্রমকে পরিচালিত করতে হলে উলামায়ে কেরামের সামরিক অংশগ্রহণ এবং জিহাদী দলগুলোকে শরীয়ত ও চিন্তাক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতৃত্ব দানের কোনো বিকল্প নেই। একইভাবে, এই ময়দানে তাঁদের দোয়া ও কান্নাকাটি এবং অন্যদের মনোবল ও প্রত্যয় জাগ্রত করার ভার তাঁদের গ্রহণ করা খুবই জরুরী বিষয়। গৌরবের অধিকারী উলামায়ে আফগান ও দৃঢ়চেতা আফগান জাতির মাঝে জাতিগত মর্যাদাবোধ ও হিম্মত থাকাটা চলমান জিহাদী কার্যক্রম সফল হওয়ার প্রাথমিক নিয়ামক শক্তি। আর এ কারণেই শত্রু, গৌরবময় এই জাতির উলামায়ে কেরামকে লক্ষ্যস্থল বানানো ছাড়া আর কোনো উপায় দেখল না। তারা এই নীতি গ্রহণ করেছে যে, উম্মতে মুসলিমার বড় বড় আলিম ও বিশ্বস্ত মাশায়েখে কেরাম, যারা সমকালীন আফগান জিহাদকে সঠিক মানদণ্ডে পরিচালিত করার জন্য নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন; তাদেরকে লক্ষ্যস্থল বানানো। তাদের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক অপরাধগুলোর মধ্যে এটা একটি।

মুজাহিদদেরকে উপর্যুপরি হামলা ও আক্রমণের শিকার বানানোর পর সর্বশেষে বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীদের কালো হাত যাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন ফজিলাতুশ শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিস শহীদ-বিইযনিল্লাহ মাওলানা সামিউল হক হক্কানী রহিমাহুল্লাহ। তিনি দারুল উলুম হাক্কানিয়া মাদরাসার মুহতামিম। মাদরাসাটি মুসলিম বিশ্বে প্রথম সারির ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। শয়তানের দোসররা পুণ্যবান, মুহাদ্দিস, অশীতিপর বয়োবৃদ্ধ এই আলিমকে ১৪৪০ হিজরি সনের সফর মাসের ২৩ তারিখ জুমার দিন আসরের সময় পরপারে বিদায় করে দেয়—ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আফগান ও পাকিস্তানের ভূমিতে উলামায়ে ইসলামের প্রসিদ্ধ আলেমদের এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা তাদের এবারই প্রথম নয়। বরং তারা ইতিপূর্বে শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিস শহীদ-বিইযনিল্লাহ মুফতি নিজাম উদ্দিন শামযায়ী এবং শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিস আল মুসনাদ মাওলানা হাসান আল মাদানী তাকাব্বালাহুমুল্লাহ্- উভয়কে শায়খ সামিউল হক রহিমাহুল্লাহর মতই প্রতারণামূলকভাবে হত্যা করে। এমনই আরও অনেকে রয়েছেন যারা ক্রুসেডার ও মুরতাদগোষ্ঠীর কারাগারের অভ্যন্তরে নিহত হয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার পতন ঘটাতে ক্রুসেডার সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করার পর এমনই অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সেসব হত্যাকাণ্ডের শিকার আলেমদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন: শায়খ ফকীহ মুজাহিদ উস্তায মুহাম্মদ ইয়াসির আলওয়ারদাকী, শায়খ মুহাদ্দিস শহীদ নসিব খান আলওয়াযিরী, আল্লামা ফকীহ মুফাসসির অলিউল্লাহ আল কাবুলগারামি এবং শায়খ মুফাসসির সুলতান আরিফ সোয়াতী। তাকাব্বালাহুমুল্লাহ্!

আফগানিস্তানের নুরিস্তান প্রদেশে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শায়খ মুহাদ্দিস মুফাসসির আল্লামা মুহাম্মদ নুরিস্তানীকে ড্রোন বিমান থেকে ছয়টি হিল ফায়ার ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্যে আমেরিকা কিরূপে কাপুরুষোচিত হামলা করে শহিদ করে দিল! সেসময় তিনি মুজাহিদ ভাইদের একটি মজলিসে তাফসির করছিলেন। হামলায় শায়খের দেহ পুরো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ষাটোর্ধ বয়োবৃদ্ধ এই শায়খের বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার ওপর এতটুকু মায়া হয়নি পাষণ্ডদের। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! তারা এমন এক শুভ্রকেশ বিশিষ্ট ভদ্রলোককে শেষ করে দিল যার কপালে আঁকা ছিল সেজদার চিহ্ন। যিনি তাসবীহ কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতেন। পিতৃতুল্য আল্লামা মাওলানা সামিউল হক ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ শিক্ষক। আফগান মুজাহিদদের সবচেয়ে বড় সমর্থকদের একজন ছিলেন তিনি; যেমনটি ছিলেন মুফতি নিজাম উদ্দিন শামযায়ী (আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উভয়কে কবুল করুন)।

তাঁরা উভয়ই ছিলেন শায়খ মুজাহিদ শহীদ উসামা বিন লাদেন তাকাব্বাল্লাহুর একান্ত প্রিয়ভাজন, ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। উভয়ই কান্দাহারে শায়খের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হতেন। সবসময়ই তাঁদের মাঝে পত্র মারফত যোগাযোগ এবং কুশল বিনিময় অব্যাহত ছিল। শায়খ সামিউল হক গর্ব করতেন যে, তাঁর একেকবারের কান্দাহার সফরে শায়খ উসামা খাওয়ার আগে পরে তাঁকে হাত ধোয়ানোর জন্য নিজে পানি ঢেলে দিতেন। অতএব, আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে কামনা করি, তিনি যেন পুণ্যবান এসব লোকের মেহনতকে কবুল করেন এবং নিজ রহমতের সুবিস্তৃত চাদর দিয়ে তাঁদেরকে জড়িয়ে নেন! নিশ্চয়ই তিনি এ কাজের তত্ত্বাবধায়ক এবং এ বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান।

কলমের কালি শুকিয়ে লেখা বন্ধ হবার আগেই সময়ের কিছু দাবি আমি পেশ করতে চাই। এবার তাহলে সে দিকে যাওয়া যাক। 'রিব্বি'-দের আয়াতের কাঠামোগত এমন অনেক নিগূঢ় অর্থ আমেরিকা ও তাঁর থিংক ট্যাংকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছে, যেগুলো অনেক মুসলমানও উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। তারা (আমেরিকানরা) এই আয়াতের প্রকৃত বাস্তবতা এবং এই আয়াতে উল্লেখিত পরিণতির সঙ্গে ইলম ও আমলের বেষ্টনীতে ঘেরা ঈমানের যে সেতুবন্ধন রয়েছে, সেটা আবিষ্কার করতে পেরেছে। এ কারণেই জিহাদ ও মুজাহিদদের সমর্থক উলামায়ে উম্মাহকে টার্গেট করে একের পর এক শহীদ করে দিতে তারা কোন কসুর করেনি।

মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সভ্যতার উপর তাদের অন্যায় আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে এ কাজগুলো তারা রুটিন মাফিক সম্পাদন করে চলেছে। এ কারণেই এই সময়ে জিহাদি সচেতনতা হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, কোরআন সুন্নাহর আলোকে রিব্বিদের জামাত তৈরিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করা। তাঁদের উৎসমূল সংরক্ষণ করা এবং তাঁদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া। এভাবে তাঁদের পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর মুজাহিদ দলগুলোর প্রথম সারিতে অধিকহারে তাঁদেরকে প্রেরণ করা। কারণ গোটা মুসলিম উম্মাহর ওপর তাঁদের বিরাট প্রভাব রয়েছে। পুণ্যবান পূর্বসূরিদের মাঝে যারা গত হয়ে গেছেন এবং নিজেদের আদর্শ যারা বিকিয়ে দেননি, তাঁদের মানহাজ ও মতাদর্শের উপর চলার ক্ষেত্রে এই জামাতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শায়খ মুজাহিদ শহীদ আবু ইয়াহহিয়া আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এগুলো এমন কিছু বাস্তব ঘটনা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। কারণ যুগে যুগে এসব ঘটনার প্রতিচিত্র বার বার ফুটে উঠবে। মহাকালের সুবিশাল ক্যানভাসে এসব দৃশ্য সর্বদাই ভাসমান থাকবে। ঐশী বানীতে বিজয় লাভের কথা এভাবে এসেছে যে, তারা পেয়েছেন 'দুনিয়ার সওয়াব'। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, জিহাদের পথে ও সংগ্রামী যাত্রায় মুজাহিদদেরকে কি কি করতে হবে? জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি তাঁরা শরীয়ত ও বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলীর আলোকে সঠিক পন্থা অনুসরণ করেন তবে আল্লাহর সাহায্য তাঁদের সন্নিকটে। তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের অবস্থা শত্রুদের মত নয়। শত্রুরা তো প্রতিষ্ঠা লাভের প্রশ্নে বস্তুবাদী সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো অপরাধ, অবিচার ও অন্যায়ের পরোয়া করে না। তারা শক্ত ঈমানের সঙ্গে দুর্বল ঈমানের পার্থক্য বোঝে না। তারা মনে করে না যে, তাদের বাহিনী ও দলের মাঝে অন্যায়-অপরাধের সংঘটন, বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক, বিনাশী ও বিধ্বংসী।

যারা এই সংক্রান্ত প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে না পেরে একে অবহেলা করে এবং এর দিকে মাথা তুলে তাকায় না; বরং বিজয়ের সন্ধান করে কেবলই গুদামভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, বৈষয়িক উন্নত প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত কর্মপন্থা ও মেধা ব্যয় এবং গভীর গুপ্তচরবৃত্তির মাঝে, এদিকে কোনো অন্যায়-অপরাধ এবং গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে থাকে বেপরোয়া, আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা বর্জনের ব্যাপারে হয় নিঃস্পৃহ, এমন লোকেরা নিজেরা যেমন ধ্বংসের পথে, তেমনই তারা অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ'।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহিমাহুল্লাহ 'রিব্বি'দের আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'এই আয়াত এবং এর পূর্বের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পরাজিত মানসিকতার মুমিনদেরকে তিরস্কার করেছেন-

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

"তোমরা কি ভেবেছ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে অথচ আল্লাহ তায়ালা এখনও দেখেন নি তোমাদের মাঝে কারা জিহাদ করেছে?"

এই তিরস্কার ওই সমস্ত লোকের জন্য যারা লড়াই ছেড়ে দিয়ে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল, অথবা যারা এক ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা করতে শুনে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল যে, 'নিশ্চয়ই মোহাম্মদ নিহত হয়ে গিয়েছে'।

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের এই পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও লড়াই ছেড়ে দেওয়াকে নিন্দা করে একথা বলছেন যে, 'যদি মুহাম্মাদ মারা যান অথবা নিহত হন, হে মুমিনরা! তবে কি তোমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে?' অতঃপর তিনি তাঁদের সামনে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীদের বিরাট অংশের অবস্থা তুলে ধরেছেন এবং তাদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীরা তাঁদের নবী নিহত হলে নবীদের আদর্শের ওপর টিকে থাকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাঁদের মাঝে মর্যাদাবান আহলে এলেমরা যে উদাহরণ পেশ করেছেন, তোমরা কেনো তাঁদের মত সেরকম দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারলে না? নবীদের ইন্তেকালের পরেও আল্লাহর দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নবীদের সঙ্গে থাকাকালীন লড়াইয়ের মতোই তাঁরা যেভাবে লড়াই করে গেছে, তোমরা কেন তাঁদের মত সেভাবে লড়াই চালিয়ে গেলে না?' (তাফসীরে তাবারী: ৭/২৬৪)

বন্দী ভাইদেরকে যেন ভুলে না যাই

শায়খ আবু দুজানা পাশা রহিমাহুল্লাহ

উম্মাহ আজ বড় বিপদগ্রস্ত। একের পর এক দুর্যোগ আছড়ে পড়ছে উম্মাহর ওপর। হক ও বাতিলের মাঝে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এ আগুনে পুড়ে খাটি সোনায় পরিণত হচ্ছে উম্মাহর অন্তর্গত মুজাহিদদের সেই দলটি যাঁরা অবিচলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। যাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে বিসর্জন দিচ্ছেন এই দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য। উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের শ্রেষ্ঠ লোকগুলো নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দিচ্ছেন।

এই উম্মাহর সবচেয়ে গভীর ক্ষত ও বড় বিপর্যয়গুলোর একটি হচ্ছে - কাফের-মুশরিক ও তাদের মুরতাদ আমলাদের কারাগারে বন্দী মজলুম মুসলিম। বন্দীদের কাফেলার সদস্য সংখ্যা দিন দিন শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে কিন্তু তাদের মুক্তির ক্ষীণতম সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তাদের এই দুর্ভোগ কবে শেষ হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মহৎপ্রাণ এসমস্ত ব্যক্তি জালিমের কারাগারে নানা প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হচ্ছেন। এরা কারা? বিশ্ববাসীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণী (আমরা এমনটাই মনে করি) — এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা হলেন তাইফা আল-মানসুরা বা সদা সাহায্যপ্রাপ্ত সেই দল, যারা আল্লাহর পথে জিহাদরত। যারা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন, স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করার জন্য। উম্মাহর জন্য আজ তাঁরা বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের মুখোমুখি। তাঁদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগুলো আজ দাস বাজারে বিক্রি হচ্ছে। শয়তানের গোলামরা তাঁদেরকে দিয়ে ব্যবসা করে নিজেদের মনিবদের নৈকট্য লাভ করছে। জালিমের দল কিছুতেই নিবৃত্ত হচ্ছে না। আল্লাহর মুমিন বান্দাদের ব্যাপারে অন্যায় করতে তাদের বিবেক এতটুকুও বাঁধা দেয় না।

অপরদিকে উম্মাহ একমত, যে-কোনো পন্থায়ই হোকনা কেন, তা প্রয়োগ করে এসব বন্দীকে মুক্ত করা ওয়াজিব। কিতাব-সুন্নাহর প্রত্যক্ষ নির্দেশনা এ বিষয়ে ভরপুর। এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী মুসলিম ইমামদের পথ ও পন্থা। একজন বন্দীর জন্য, তাঁরা সেনাবাহিনী নিয়ে শহরের পর শহর জয় করেছেন। তুমুল যুদ্ধ লড়ে বিপুল অর্থ গনিমত লাভ করেছেন। আজকের মত হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু বন্দী হলে তারা কি করতেন?! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না? অথচ অসহায় নর-নারী ও শিশুরা কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের মালিক,আমাদের যালেমদের এই জনপদ থেকে বের করে (অন্য কোথাও) নিয়ে যাও, অতপর তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিভাবক (পাঠিয়ে) দাও, তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও!' [সূরা আন-নিসা,৪:৭৫]

কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না?' এই আয়াতে জিহাদের প্রতি জোরালোভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ কাফির-মুশরিকদের ন্যক্কারজনক শাস্তি এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদের ফেতনা থেকে দুর্বলদেরকে মুক্ত করার মাধ্যম হলো এই জিহাদ। তাইতো আল্লাহ তায়ালা নিজ কালিমা বুলন্দ করার জন্য, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং তাঁর বান্দাদের থেকে দুর্বল মুমিনদেরকে উদ্ধার করার জন্য জিহাদকে ওয়াজিব করেছেন। যদিও এতে প্রাণহানি রয়েছে তবুও এটি ওয়াজিব। কারণ, লড়াইয়ের মাধ্যমে হোক কিংবা মুক্তিপণের ব্যবস্থা করেই হোক, মুসলিমদের জামাতের কর্তব্য হলো বন্দীদেরকে মুক্ত করা। এক্ষেত্রে মুক্তিপণ বিধিবদ্ধ হয়েছে এ কারণে যে, এটি প্রাণের চেয়ে তুচ্ছ'। ইমাম মালেক বলেন, 'মানুষের উপর ওয়াজিব হলো, সমস্ত সম্পদ দিয়ে হলেও বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই'।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন , فكوا العاني - তোমরা বন্দী মুক্ত করো'। হাদীসে বর্ণিত عاني শব্দের অর্থ হলো: বন্দী। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'যদি কোনো মুসলিম অপর কোনো মুসলিমকে এমন অবস্থায়

ছেড়ে আসে যেখানে তার সম্ভ্রমহানি হচ্ছে এবং তার সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে, তবে আল্লাহ তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে আসবেন যখন সে সাহায্য পেতে চাইবে। আর যদি কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে এমন জায়গায় সাহায্য করে যেখানে তার সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে এবং ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, তবে আল্লাহ তাকে এমন জায়গায় সাহায্য করবেন যেখানে সে সাহায্য পেতে চাইবে'।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সামান্য একটি পার্থিব কষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ্ তার থেকে পরলৌকিক বড় একটি বিপদ দূর করে দেবেন'।

ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'কাফেরদের হাত থেকে একজন মুসলিমকে মুক্ত করতে পারা আমার কাছে জাজিরাতুল আরবের চেয়েও বেশি প্রিয়'।

খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি পত্রে বলেন, 'হামদ ও সালাতের পর...তোমরা নিজেদেরকে বন্দী ভাবছ। আল্লাহর কসম! তোমরা তো আল্লাহর রাস্তায় আটকা পড়ে আছ। তোমরা জেনে রাখ, প্রজাদের মাঝে আমি যা কিছুই বণ্টন করেছি, তারমধ্যে বিশেষভাবে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সর্বাধিক ও সর্বোৎকৃষ্ট অংশটা দিয়েছি। আমি পাঁচ দিনার দিয়ে তোমাদের কাছে অমুকের ছেলে অমুককে পাঠিয়েছি। রোমের স্বেচ্ছাচারী শাসক তোমাদের থেকে অর্থ ছিনিয়ে নেবে এই ভয় যদি আমার না হতো তবে আমি আরও বাড়িয়ে পাঠাতাম। এদিকে অমুকের ছেলে অমুককে আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি যেন সে তোমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ ও দাস-মনিব সকলের জন্য মুক্তিপণের ব্যবস্থা করতে পারে। অতএব, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। ওয়া আসসালাম!'

এমনিভাবে আমাদের সালফে সালেহীনরা এই ওয়াজিব বিধানটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা এবং এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা দানের ক্ষেত্রে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইবনুল আরাবী বলেন, 'সশরীরে তাদেরকে এমনভাবে সাহায্য করা ওয়াজিব হবে যে, আমাদের সংখ্যা যদি পর্যাপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে উদ্ধার করতে রওয়ানা হওয়ার পর কেউই যেন পেছনে না থাকে। আর না হয় তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এমনভাবে আমাদেরকে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে হবে যে কারো কাছে যেন একটি দিরহাম পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে'। ইমাম মালেকসহ উলামায়ে কেরাম সকলেই এমনটাই বলেছেন। বর্তমান সময়ে মুসলিমরা শত্রুদের অনুগ্রহের উপর নিজেদের ভাইদেরকে ফেলে রাখছে অথচ তাদের কাছে রয়েছে সম্পদের স্তূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিপুল অর্থ, শক্তি-সামর্থ্য আর প্রাচুর্যের উপকরণ। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন!

ইমাম কুরতুবী বলেন, "আল্লাহর কসম! আমরা সকলেই অন্য সবার বিপদ মুসিবত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ফলে আমরা একে অপরের উপর হামলা করছি। আর এক্ষেত্রে মুসলিমদের সাহায্য না নিয়ে কাফেরদের সাহায্য নিচ্ছি। আমরা আমাদের ভাইদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ অবস্থায় ফেলে রেখেছি। মুশরিকদের নিয়মকানুন তাদের ওপর কার্যকর করা হচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আমাদের আলিমগণ বলেছেন, 'বন্দীদের মুক্ত করা ওয়াজিব যদি এক দিরহামও অবশিষ্ট না থাকে'। ইবনে খোয়াইয মিন্দাদ বলেন, 'আয়াতটিতে বন্দী মুক্ত করা ওয়াজিব করা হয়েছে। আর এই বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি নিজে বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং অন্যদেরকে বন্দী মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের যুগ যুগ ধরে আমল এমনই। এ বিষয়ে উম্মাহ একমত। সাধারণ অবস্থায় বায়তুলমাল থেকে বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। যদি বায়তুলমাল না থাকে তবে সকল মুসলিমের উপর মুক্তিপণের ব্যয়ভার বহন করা ফরজ। তাদের মাঝে কেউ এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে'।

ইয ইবনে আব্দুস সালাম বলেন, "কাফেরদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদেরকে উদ্ধার করা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতসমূহের একটি।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, 'তারা যদি একজন মুসলিমকে বন্দী করে, তবে আমাদের জন্য ওয়াজিব হলো, অবিরতভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ আমরা ওই বন্দীকে মুক্ত করতে না পারছি কিংবা তাদেরকে ধ্বংস করে না দিচ্ছি'। এখন তারা যদি মুসলিমদের বিরাট একটা অংশকে বন্দী করে, তবে এর গুরুত্ব কেমন হতে পারে বলে ধারণা হয়?"

এই ওয়াজিব বিধানটির দলিলসমূহ হাজির করা এখানে আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তবুও আমি এ রচনাটি প্রস্তুত করেছি আল্লাহ তায়ালার এই বাণীর অনুসরণে—

وذكر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين

আর আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

আমি এই কথাগুলো লিখেছি, যাতে আমরা এই বিশ্ব বাস্তবতায় দুর্যোগের যাঁতাকলে পিষ্ট আমাদের বন্দী ভাইদেরকে ভুলে না যাই। আমি সাধারণভাবে সকল মুসলিমকে এবং বিশেষভাবে মুজাহিদ দলটিকে এই বন্দীদের ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কলম হাতে নিয়েছি। জালিমগোষ্ঠী এবং তাদের আমলারা যখন নিজেদের অপবিত্র হাত দিয়ে এই উম্মাহর গৌরব ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত করছে, এ অবস্থায় বন্দী ভাইদেরকে মুক্ত করে সেই সম্মান ও গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়াসী হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাণ বিসর্জন ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে বন্দী মুসলিমদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হলে তা হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন। নিঃসন্দেহে এটি আমাদের উপর ঝুলে থাকা একটি শরয়ী ওয়াজিব আদায় হিসাবে গণ্য হবে। এই উম্মাহ সংকটাপন্ন অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এবং নিষ্ঠাবান মুসলিম সন্তানরা কঠিন অবস্থা পার করছে। এমতাবস্থায় এই দায়িত্ব পূরণ করা যদিও সহজ নয়, কিন্তু তাই বলে অনেকেই যে এটাকে অসম্ভব বলে দাবি করেন, সে কথাও সঠিক নয়।

তাগুত গোষ্ঠীর বোধগম্য ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করাটুকুই আমাদের কাজ। আর আমরা সকলেই জানি, শক্তির ভাষা ছাড়া তাগুত গোষ্ঠী আর কিছুই বুঝে না। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তারা কিছুতেই ঠিক হবে না। শক্তির ব্যবহার ছাড়া তারা কিছুতেই আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আটককারী জালিম গোষ্ঠীকে এবং তাদের তোষামোদকারী ও পদলেহন-কারীদেরকে অন্য কোনোভাবে চাপ দেওয়া যাবে না। বরং রাজনৈতিকভাবে, দাওয়াতি পন্থায়, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদির মাধ্যমে, তাদের নিপীড়ন ও কুকর্ম মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। বন্দীদের ব্যাপারে উম্মাহর দায়িত্ব উম্মাহকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞাত বিস্মৃত সাহায্যের কাঙ্গাল নারী-শিশুদের ব্যাপারে উম্মাহর দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এক কথায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে জালিম গোষ্ঠীর উপর চাপ প্রয়োগ করাও আমাদের কর্তব্য। অথচ আমরা একেবারেই গাফেল! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মুসলিম বন্দীরা, কাফের গোষ্ঠীর কারাগারে বন্দী থাকুক কিংবা তাদের আমলা মুরতাদ গোষ্ঠীর কারাগারে থাকুক, তাঁদেরকে মুক্ত করার জন্য আমরা যদি চেষ্টা করি, তাহলে তাঁদের ব্যাপারে আমাদের উপর চেপে থাকা দায়িত্ব পালিত হবে। তাঁদের হক আদায় করা হবে।

এর পাশাপাশি এতে করে আমাদের বন্দী ভাইদের মনোবল চাঙ্গা হবে। তাঁদের দুর্ভোগ কমবে। তাঁরা এই ধারণা লাভ করবে যে, তাঁদের পেছনে পুরো একটি জাতি চিন্তা শক্তি ব্যয় করছে। তাদের ভাইয়েরা এই প্রতিজ্ঞায় নিজেদেরকে আবদ্ধ করেছে যে, সম্মানের সঙ্গে এই বন্দীদশা থেকে যতদিন তাঁরা, তাঁদের ভাইদের মুক্ত করতে না পারছে, পরিবার-পরিজনের কাছে যতদিন তাঁরা, বন্দী ভাইদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে না পারছে; ততদিন তারা কিছুতেই শান্ত হবে না, তাঁদের মাঝে স্থিতি ফিরে আসবে না। আমাদের এই প্রয়াস ইনশাআল্লাহ বন্দী ভাইদের নিজেদের দ্বীনের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। যে আদর্শের জন্য তাঁদেরকে আটক করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সে আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে।

তাছাড়া, এতে বন্দীদের পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা হবে। তাঁদের মনোবল দৃঢ় হবে। তাঁদের মনে এই আশা সঞ্চারিত হবে যে, অচিরেই সেদিন আসছে যেদিন আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তাঁরা আপনজনকে দেখে নিজেদের চক্ষু শীতল করতে পারবেন।

একইভাবে, এতে উম্মাহর মনোবল দৃঢ় হবে। উম্মাহ দেখতে পাবে, তার সন্তানদের মাঝে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে তার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে এবং তাকে দেখে আরো অনেকেই জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত হবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ! মতপার্থক্য সত্ত্বেও এ বিষয়ে উম্মাহর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত।

এমনিভাবে মুসলিম বন্দীদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করা হলে আমাদের শত্রুরা এই বার্তা পাবে যে, আমরা কিছুতেই জুলুম মেনে নেব না। আমরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কিছুতেই সহ্য করব না। এমনিভাবে গোটা বিশ্ববাসী এই বার্তা পাবে যে, আমাদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যাবে, আমাদের সকলের প্রাণ উৎসর্গিত হয়ে যাবে, আমাদের অর্থ-কড়ি সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে, প্রয়োজনে আমরা গাছের পাতা খাব, আমরা পেটে পাথর বাঁধব, তবু আমরা আমাদের বন্দী মুসলিম ভাইদেরকে মুক্ত করে ছাড়ব। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে তারা নিরাপদে, নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝাটে,সচ্ছল ,স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করছে, এটি না দেখা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই থামব না।

শেষ করব উম্মাহ এবং তার মুজাহিদ দলটিকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে । কর্মমুখর জীবনের অধিকারী সেই আলেমের কথা বলছি, যিনি বিপদ-আপদ সহ্য করে ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিপদ-আপদে, সহিষ্ণুতা ও অবিচলতায় যিনি পর্বতপ্রমাণ। বন্দী-স্বাধীন সকলের যিনি ইমাম। যিনি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং জালিম ও মুশরিকদের আতঙ্ক। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন ডক্টর ওমর আব্দুর রহমান। আমি ভাইদেরকে বলব, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! এ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন!

আমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তখনই সাহায্য করেন, যখন তারা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে তখনই মদদ দান করেন, যখন তারা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে। আমাদের দায়িত্ব তো শুধু এটাই যে, আমরা আল্লাহর ওয়াদা সত্য মনে করে বাতিল শক্তির ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকব, এরপর তো আল্লাহই তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিবেন। আমরা তো সংখ্যা বা বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি না; বরং আমাদের হাতিয়ার তো হলো এই দ্বীন। আমরা তো আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করতে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হই। আমাদের শক্তি তো এখানেই। আর আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

হে আল্লাহ, পৃথিবীর সকল স্থানের আমাদের মুসলিম বন্দী ভাই-বোনদেরকে মুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি তাঁদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করে দিন এবং তাঁদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। হে রহমান, হে রহিম, আপনি তাঁদের জন্য দ্রুত আপনার রহমতের ফায়সালা করুন! ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ইমাম কুরতুবী বলেন, "আল্লাহর কসম! আমরা সকলেই অন্য সবার বিপদ মুসিবত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ফলে আমরা একে অপরের উপর হামলা করছি। আর এক্ষেত্রে মুসলিমদের সাহায্য না নিয়ে কাফেরদের সাহায্য নিচ্ছি। আমরা আমাদের ভাইদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ অবস্থায় ফেলে রেখেছি। মুশরিকদের নিয়মকানুন তাদের ওপর কার্যকর করা হচ্ছে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আমাদের আলিমগণ বলেছেন, 'বন্দীদের মুক্ত করা ওয়াজিব যদি এক দিরহামও অবশিষ্ট না থাকে'।"

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ'র সম্মানিত স্ত্রী
উমায়মা হাসান আহমাদ- এর লেখা আত্মজীবনীমূলক ধারাবাহিক রচনা

বিশুদ্ধ রক্তস্নাত আফগান

পর্ব- ০১

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নামে শুরু করছি যিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। সাহায্য ও সক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। শত সহস্র সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক মানবজাতির জন্য রহমত, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই সত্য পথের উপর থাকবেন তাঁদের উপর।

অনেক মুহাজির বোন আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের সর্বশেষ অভিযানের সময়ে আমার দেখা কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে। আমি কিছু ঘটনা লিখেছিলাম। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলো হারিয়ে যায়। আমি আবারও লেখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তবে হিজরতের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারনে দীর্ঘদিন লেখার সুযোগ করে উঠতে পারিনি।

পরবর্তীতে আমি মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আমেরিকার অপরাধসমূহ সাক্ষ্যপ্রমাণসহ লিখতে শুরু করি। ইসলাম আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিদ্বেষ আর ঘৃণার প্রকৃত চেহারা তুলে ধরার এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ছিল সেটি। আমি এখানে যা তুলে ধরছি তা আফগানিস্তানে মুহাজির মুজাহিদদের আত্মত্যাগের অসংখ্য ঘটনার মাঝের একটি ঘটনা। মুজাহিদদের জন্য বিশ্বের অন্যান্য জায়গাগুলোতে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাওয়ায় ১৯৯৬ সালে আমি আফগানিস্তানে হিজরত করি। বিশ্বজুড়ে মুজাহিদদের জন্য স্থান সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। এমন অবস্থায় আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারাহর উত্থান হয়। এসময়ে অসংখ্য মুজাহিদ এই বরকতময় ভূমিতে হিজরত করেন। তাঁদেরকে সাদরে বরণ করে নেন এই সম্মানিত, ন্যায়নিষ্ঠ আফগান জাতি। এমন মানুষদের একত্রিত হবার ব্যাপারটা আমেরিকা আর তার দোসরেরা সহ্য করতে পারল না। এরকম ঘটনা এই প্রথম নয়।এর আগেও আফগান আর আরবরা এমনভাবে একত্রিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। সেবার রাশিয়া পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানের ভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর আবারও আফগান আর আরবরা মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে ইসলামী ইমারাহর পতাকাতলে একত্রিত হয়েছিলেন। সত্যিকারের স্বাধীনতার বরকত নিয়ে এবার তাঁরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই লড়াইয়ের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইহুদি, খ্রিস্টান। আর মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদি,খৃস্টানদের সাগরেদরা - যারা মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করেছে, মুসলিম ভূমিগুলোকে শোষন করেছে, সম্পদ লুটপাট করেছে আর মুসলিমদের অপমানিত করেছে।

আর তাই আমেরিকা, ইহুদি আর তাদের দালালরা আতঙ্কিত হয়ে সদ্যগঠিত ইসলামী ইমারাহকে শুরুতেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। আর তাদের এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইসলামী ইমারাহর বিরুদ্ধে তারা সর্বশক্তি দিয়ে বিমান হামলা শুরু করে। ৯/১১ ছিল আমেরিকার জন্য একটা অজুহাত মাত্র। অনেকেই সেই সময় বিশ্বাস করত যে, ৯/১১ এর ঘটনার পর আমেরিকার প্রতিশোধ নেবার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ৯/১১ এর আক্রমণ হয়েছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার চরম নিপীড়নের প্রতিবাদ হিসেবে। ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের অন্যায় অত্যাচারে আমেরিকার একপেশে সমর্থন আর মুসলিম দেশসমূহে দুর্নীতিবাজ জালিম সরকার চাপিয়ে দেয়ার প্রতিরোধ হিসেবে।

আফগানিস্তানে আমেরিকার অবৈধ দখলদারিত্ব শুরু হলে আমরা,আমাদের কাবুলের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। আমার সাথে ছিলেন সায়্যিদা আহমাদ হালওয়া। সায়্যিদা হালওয়া ছিলেন আহমাদ নাজ্জার রহিমাহুল্লাহর স্ত্রী। তাঁর শাহাদাতের পরে তারিক আনওয়ারের সাথে সায়্যিদা হালওয়ার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তারিক আনওয়ারের শাহাদাতের আগ পর্যন্ত আট মাস তাঁরা একসাথে ছিলেন। আমাদের সাথে আরও ছিলেন নাসর ফাহমি নাসর, তাঁর স্ত্রী উম্মে আয়াত সাদিয়া আহমাদ বুয়ুমি ও তাঁদের সন্তানেরা (রহিমাহুমুল্লাহ)। উম্মে আয়াত সাদিয়া ছিলেন শহীদ নাযিহ নুশি রশীদ রহিমাহুল্লাহর স্ত্রী। তাঁর শাহাদাতের পরে নাসর ফাহমি নাসর তাঁকে বিয়ে করেন, আর তাঁরা দুজন একসাথেই শাহাদাত বরণ করেন।

ডা. আয়মান আয-যাওয়াহিরীর স্ত্রী উম্মে ফাতিমা ইযযাহ আনওয়ার নুয়াইর রহিমাহুল্লাহ আর তাঁদের চার সন্তানও আমাদের সাথে ছিলেন। এই সময়ে ডা. যাওয়াহিরী, শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহর সাথে তোরাবোরায় অবস্থান করছিলেন। আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল সায়্যেদ আর উনার স্ত্রী খাদীজা তাঁদের ছোট দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের সাথে ছিলেন। খাদীজা ছিলেন শায়খ আবু ইসমাইল আহমাদ বিসওনী আল দুয়াইদারের মেয়ে। আল্লাহ তাঁদের সবার উপর রহম করুন।

আমরা সবাই একসাথে খোস্ত যাচ্ছিলাম। সেখানে আবু হামযা আল যাওফী রহিমাহুল্লাহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর বাসায় এক সপ্তাহ অবস্থান করি। এরপর উম্মে ফাতিমা, উম্মে আয়াত, খাদীজা আর তাঁদের সন্তানদেরকে উম্মে হামযা আল যাওফীর কাছে রেখে আমরা ওয়ারদাকের পথে রওনা হই। ওয়ারদাকে, আমরা উস্তাদ মুহাম্মাদ ইয়াসির (আল্লাহ তাঁকে কবুল করে নিন) এর বাসায় দুইমাস থাকি। এরপর আমরা তাশরাখে যাই আর আবারও সবাই স্বামী সন্তানদের সাথে একত্রিত হই, একমাত্র ডা. যাওয়াহিরী ব্যতীত।

আমরা তাশরাখে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান করি। সেখানে আমাদের মনে সবসময় একটা স্বস্তিদায়ক নিরাপত্তাবোধ কাজ করছিল। তবে একের পর এক শহর নর্দান এলায়েন্সের দখলে আসতে থাকে। আর পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। তাশরাখ, লোগার প্রদেশের অংশ ছিল। লোগারের পতনের পর আমার স্বামীসহ অন্যান্য ভাইয়েরা আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। নর্দান এলায়েন্স আমাদের এলাকার বেশ কাছে চলে এসেছিল। তাই, আমরা কান্দাহারে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিই।

দুপুরের দিকে বের হবার সময় এলাকাবাসীর কাছে জানতে পারলাম যে কান্দাহারে যাবার রাস্তা ট্যাংক দিয়ে অবরোধ করা হয়েছে। আর সেখানে যুদ্ধবিমান টহল দিচ্ছে। এই পথে যাতায়াতকারী যেকোন গাড়িই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম। রওনা দিব দিব করছিলাম।এমন সময় এলাকাবাসীর কথাবার্তা শুনে কান্দাহার না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ চিন্তার কিছু নেই, আমরা আপনাদের সাথে আছি'।

মাথার উপরে প্রচুর যুদ্ধবিমান উড়ছিল। পরিস্থিতি বেশি ভালো মনে হচ্ছিলনা। বিপদ যেন ওঁত পেতে ছিল। ভাইয়েরা সেই রাতেই খোস্ত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আমাদের ক্যারাভান আগের মত সজ্জিত করা হয়- একটা বাসে আমি, তারিক, সায়্যিদা হালওয়া আর তাঁর পাঁচ সন্তান। আরেকটা বাসে নাসর ফাহমি নাসর, তাঁর স্ত্রী ও সাত সন্তান এবং তাঁদের সাথে ডা. যাওয়াহিরীর স্ত্রী ও চার সন্তান। আরেকটা গাড়িতে মুহাম্মাদ সায়্যেদ, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান।

রাত আটটার দিকে আমরা খোস্তের পথে রওনা দিই। নভেম্বর মাসের শীতের এক রাত ছিল। হাড় কাপানো ঠান্ডা পড়েছিল। আমরা দ্রুত গতিতে চলছিলাম। পুরো পথ জুড়েই তালেবানদের উপস্থিতি ছিল। তাঁরা আমাদেরকে অধিকতর নিরাপদ পথ দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। কোন কোন রাস্তাগুলো নর্দান এলায়েন্স বন্ধ করে দিয়েছে সেগুলো জানাচ্ছিলেন। আমাদের মাথার উপরে সারাক্ষণই যুদ্ধবিমানের আনাগোনা ছিল।সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখছিলাম আর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কথা স্মরণ করছিলাম। গার্দেজের প্রধান সড়কে পৌঁছে তালেবানদের এক বিরাট দলের দেখা পেলাম। তাঁদের দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম। তখন রাত প্রায় ১১টার মতো বাজে। তাঁরা আমাদেরকে সামনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বললেন যে খোস্ত যাবার রাস্তা বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে আমরা গার্দেজেই শায়খ জালালুদ্দিন হাক্কানীর বাসায় আশ্রয় নিই। গেস্ট হাউজ হিসেবেই তৈরি করা বাসাটা ছিল বেশ বড়। আমরা সবাই দ্বিতীয় তলায় উঠে যাই। একটা ঘরে ছিল সব নারী ও শিশু। আর এর মুখোমুখি ঘরে সব পুরুষ ও ছেলেরা। দুই ঘরের মাঝে ছিল এক লম্বা করিডর। যার শেষ প্রান্তে টয়লেট। আমরা আমাদের ঘরে ঢোকার পর পরই আকাশে বিমানের আওয়াজ বাড়তে থাকল। খাদিজার অনুমতি নিয়ে একজন বোন তাঁর স্বামীকে বিমানগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে যান।

তাঁর স্বামী তাকে আশ্বস্ত করেন যে ভয়ের কিছু নেই আর বলেন আল্লাহর উপর ভরসা করতে। বোনটি আমাদের ঘরে এসে এই আশ্বাসের কথা জানান। এই কথা শুনে উম্মে আয়াতের মুখে চমৎকার এক নূর চলে আসে । তিনি বলেন, 'হয়ত আজ রাতে ঘুমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শাহাদাত দান করবেন। আমি জান্নাতে আমার রবকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করব'। তাঁর কন্যা আয়াত, আমার সাথে কথা বলছিল। আমি ওর চেহারাতে এক প্রশান্তির নূর দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে'।

সে হেসে উত্তর দিল, 'আন্টি, আপনি সবসময় আমার অধিক প্রশংসা করেন!' এই মেয়েটি সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্ত করেছিল আর তার তিলাওয়াত ছিল খুবই সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সবাইকে কবুল করে নিন। আমরা সবাই একসাথে মাগরিব আর ঈশার সালাত পড়ে নিয়েছিলাম। তবে খাদীজা বিনতে আবি ইসমাঈল পড়েননি, তাই তিনি নামায পড়তে শুরু করলেন। তাঁর দুই সন্তান বসে ছিল তাঁর পায়ের কাছে। আমরা ঘরের ডানদিকে তোশক বিছিয়ে ঘুমের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। রাতের যিকির শুরু করার সময় যুদ্ধবিমানের আওয়াজ কমে আসতে লাগল। মনে হল সেগুলো অনেক দূরে চলে গেছে। চারপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ করেই প্রথম মিসাইলটি আঘাত হানল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের উপর বাসার ছাদ ধ্বসে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ হলেন উম্মে আয়াত, তাঁর মেয়ে আয়াত, আয়াতের ছোট বোন আয়েশা। আয়েশার যমজ বোন হাফসা বেঁচে গিয়েছিল। আয়েশার বয়স ছিল মাত্র এক বছর তিনমাস। উম্মে আয়াতের ছোট ছেলে মুহাম্মাদ ব্যাথায় কান্না করছিল। কাতর কণ্ঠে বলছিল, 'আন্টি, আমাকে এখান থেকে বের করুন'। আমি বললাম, 'ওয়াল্লাহি, বাবা, আমি একদমই নড়তে পারছিনা'। বাসার ছাদ আমাদের উপর চেপে ছিল। উম্মে ফাতিমা আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। আর বলছিলেন,'আমার বুকের উপর থেকে পাথর সরিয়ে দাও'।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে আমি তাঁকে বললাম যে, আমি নড়তে পারছিনা। এরপর আমি আর তাঁদের কোনও আওয়াজ শুনতে পাইনি। মুহাম্মাদ, উম্মে ফাতিমা কারোরই না। আল্লাহ তাঁদেরকে কবুল করে নিন। মিসাইল আঘাত হানার সময় খাদিজা সালাত পড়ছিলেন। তিনি আমার পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমি মরিয়া হয়ে হাত বাড়িয়ে তার উপর চাপা পড়া একটি কম্বল সরানোর চেষ্টা করলাম। সম্ভবত, কম্বলের কারণেই তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো লাভ হল না। আমি এক ইঞ্চিও নড়তে পারলাম না। ছাদের অংশ বিশেষ আমার বাম কাঁধের উপর শক্তভাবে চেপে বসেছিল। এই ছাদের নিচে আরও ছিলেন সায়্যিদা হালওয়া, তাঁর দুই ছেলে-আড়াই বছরের তাসনীম আর চার বছরের সালাহ। সালাহ তিনবছর আগে আফগানিস্তানের মুরতাদ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক অভিযানে শহীদ হয়। আমরা এই ক'জন একটুও আহত হইনি। আমাদের ঠিক পিছনে থাকা একটি বইয়ের শেলফ, ছাদ আর আমাদের মাঝে পড়েছিল, তাই সরাসরি আমাদের উপর ছাদ পড়েনি।

হঠাৎ আমরা উপরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা চিৎকার করতে শুরু করি, এই আশায় যে ধ্বসে পড়া ছাদের এক ছোট ফাটল দিয়ে তারা আমাদের আওয়াজ শুনতে পাবে। আমরা অবাক হয়ে বুঝলাম যে ছাদে হাঁটছিল উম্মে আয়াতের তেরো বছরের মেয়ে হাজার। মিসাইল আঘাত হানার সময় সে তার বোন হাফসার সাথে ঘুমিয়ে ছিল। হাফসাকে পরবর্তীতে ধ্বংস্তুপ থেকে উদ্ধার করা হয়। ছাদে আরও ছিল হাজারের এগারো বছর বয়সী বোন ঈমান, আর ডাক্তার যাওয়াহিরীর এগারো বছরের মেয়ে খাদিজা। তারা সবাই নিজেরাই ধ্বংস্তুপ থেকে বের হয়ে এসেছিল।

আমরা চিৎকার করে তাদের বললাম, 'তোমরা কি কিছু ইট-পাথর সরাতে পারবে যাতে আমরা বেরোতে পারি'? বাচ্চাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিলনা। ওরাও বলল যে ওরা পারবেনা। এরপর আমরা কিছু পুরুষকণ্ঠ শুনতে পেলাম। তাঁরা আরবীতে জিজ্ঞাসা করছিলেন- 'কেউ কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন'? ছাদে থাকা মেয়েরা তাদের জবাব দিল।

এসময়ে আবারো আকাশে যুদ্ধবিমানের আওয়াজ শুনে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। আমাদের চারপাশের মানুষের আওয়াজ স্তিমিত হতে লাগল আর জেটের গর্জন বাড়তে লাগল। পরে আমরা জানতে পারি যে ছোট মেয়েগুলো জেট থেকে মিসাইল বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে উঠানে চলে যায়। সেখানের একমাত্র অক্ষত দেয়ালের দিকে ফিরে, মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মিসাইলটি আবারও ছাদে আঘাত হানে। ধ্বংস্তুপের মাঝের গর্ত দিয়ে এক বিরাট আগুনের হলকা ছুটে আসে। তবে এতে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে। এই বিস্ফোরণের তোড়ে আগের ভেঙ্গে পড়া ছাদ আমাদের উপর থেকে সরে যায়। অবশেষে আমরা নড়াচড়া করতে সক্ষম হলাম।

বের হয়ে আসা মেয়েরা বিস্ফোরনের হলকায় দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ তারা সবাই বেঁচে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মিসাইলের আঘাতে যে ফাটল তৈরি হয় তাতে ডা. যাওয়াহিরীর মেয়ে নাবিলা বের হয়ে আসে। সে সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।
আবারও পুরুষেরা ফিরে আসেন আর উঠোন থেকে মেয়েগুলোকে নিয়ে কাছের এক বাসায় রেখে আসেন। এরপর ফিরে এসে তাঁরা ছাদের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে আমাদের বের করতে শুরু করেন। প্রথমেই নাসর ফাহমির মেয়ে হাফসাকে বের করে তৎক্ষণাৎ রেড ক্রিসেন্টের ক্লিনিকে নেয়া হয়। এরপর বের করা হয় মুহাম্মাদ বিন নাসরকে, তার আঘাত ছিল গুরুতর। কয়েক ঘন্টা পরই এই নিষ্পাপ শিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। উদ্ধারকারীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল আমাদের বের হয়ে আসার পথ তৈরি করতে। তাঁরা পুরোটা সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন আর আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন- 'বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হালীম আল কারীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, রাব্বাস সামাওতা ওয়া রাব্বাল আরদ্ব, রাব্বাল আরশীল কারীম'।

অবশেষে তাঁরা ছোট এক গর্ত করতে সক্ষম হন যার ভিতর দিয়ে সালাহ আর তাসনীমকে বের করা হয়। এরপর ওদেরকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। গর্তটা আরেকটু বড় হবার পর সেখান থেকে সায়্যিদা হালওয়া বের হয়। শায়খ জালাল হাক্কানী ছাদের উপর থেকে আমার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনার হাত দিন, বোন'। আমি প্রথমে ইতস্তত করি। কিন্তু ততক্ষণে আবারও আকাশে যুদ্ধবিমানের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। শাহাদাতবরণের আশায় আমি নিজেকে আটকে রাখলাম। শায়খ জালাল আবারো চিৎকার করে আমাকে বললেন, 'বোন, দয়া করে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, বিমান আমাদের মাথার উপরেই।' আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি টেনে আমাকে তুলে আনলেন। ধ্বংস্তুপ থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার প্রাণপ্রিয় বোন সায়্যিদা হালওয়াকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখলাম।

আফগানি ভাইয়েরা (আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন) আমাদেরকে একটা বাসে তুলে দিলেন। আমাদেরকে তাঁরা এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, 'ভয় পাবেন না। আমরা আপনাদেরকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ'। আমরা বারবার জানতে চাচ্ছিলাম, 'বেঁচে যাওয়া বাচ্চারা কোথায়? মেয়েরা কোথায়'? তাই, তাঁরা প্রথমে আমাদেরকে রেড ক্রিসেন্টের ক্লিনিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা সায়্যিদা হালওয়ার ছেলে সালাহ, তাসনীম আর নাসর ফাহমীর মেয়ে হাফসাকে খুঁজে পেলাম। সায়্যিদা হালওয়া তাঁর ছেলেদেরকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকলেন। আমি হাফসাকে জড়িয়ে ধরলাম, আমার দুই চোখেও বৃষ্টি নামল। আমাদের সাথে থাকা লোকদের একজন আমার কাছে জানতে চাইলেন, 'এই খুকী, আপনার মেয়ে'? আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ও আমার মেয়ে'।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা দ্রুত ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে গেলাম বাকি মেয়েদের সাথে দেখা করতে।
চলবে ইনশা আল্লাহ ...

মনিমুক্তো
উম্মাতুন ওয়াহিদাহ
(প্রথম সংখ্যা)

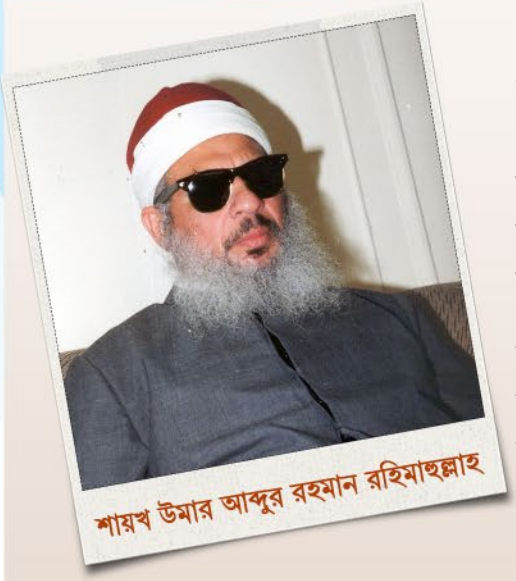

শায়খ উমার আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ

'হে উপদেষ্টা, সর্বোচ্চ রাজ্য সুরক্ষা আদালতের হে সভাপতি, জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মানদের জন্য প্রমাণ উপস্থিত হয়ে গেছে। সত্য আজ প্রকাশিত। প্রভাতের আলো আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অতএব, এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়ত দিয়ে বিচার ফায়সালা করা । তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি কাফির, জালিম ও ফাসিক।

আর শুনে রাখুন! আমরা জেল-জুলুম কোনো কিছুর পরোয়া করিনা। নির্যাতন-নিপীড়ন বা ফাঁসির ভয় আমাদের নেই। আমরা সেই কথাই বলছি, ফেরাউনের জাদুকররা ঈমান আনার পর, যা তাকে বলেছিল—

قَالُوا۟ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ

'যাদুকররা বলল, "আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে'। [সুরা তোহা, ২০:৭২]

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ

'নিজেদের মতাদর্শ তুলে ধরতে আমাদের দ্বিধা, সংকোচ বা লজ্জার কিছু নেই। নিঃসন্দেহে জিহাদ আমাদের আকিদার অংশ। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে; কোনো জালিমের জুলুম অথবা কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠা একে বন্ধ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তরবারি অথবা অস্ত্র আমাদের দ্বীনের অংশ। সন্ত্রাস বা ভীতি প্রদর্শন ঐশী বিধানাবলীর মধ্যে একটি ফরজ বিধান। গুপ্তহত্যাও ঐশী বিধানাবলীর অন্যতম। এগুলো কোরআনে বর্ণিত বিষয়। এবিষয়ে কোরআনে অকাট্যভাবে প্রত্যক্ষ নির্দেশনা এবং পরোক্ষ নির্দেশনা উভয়টি এসেছে'।

শায়খ আনোয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ

'আমরা এ কারণে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে নই যে তারা আমেরিকার অধিবাসী। আমরা তো মূলত বাতিল শক্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে; যারা একটি ভ্রান্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। অতএব, আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ আমার ও আপনার সকলের উপর ওয়াজিব। সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলমানের উপর এটি ওয়াজিব। আর যখনই আমেরিকার অপরাধ বেড়ে যাবে, যখনই এর পক্ষে লড়াইকারী সৈন্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে, যখনই তোমরা বিমানে করে আমাদের কাছে তোমাদের বোমা পাঠাবে, তখন আমরাও তোমাদের কাছে আমাদের বোমা পাঠাব। আর এই যুদ্ধ আমরা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব'।

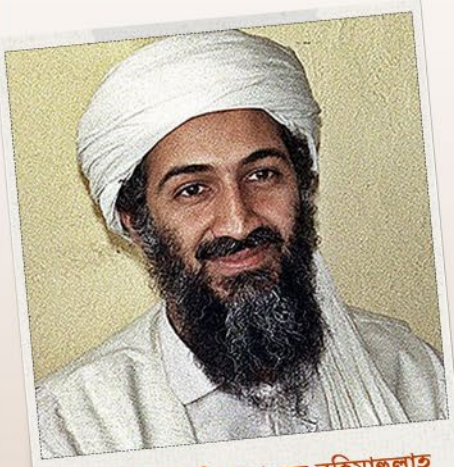

শায়খ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ

'আর কতদিন আমাদের ভাগ্যে জুটবে শুধু ভয়-ভীতি, হত্যা ও ধ্বংসলীলা, দেশান্তর ও বিতাড়ন, অনাথ শিশুর কান্না আর বৈধব্য? অপরদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতি ও নিরাপত্তা সবই তোমরা কুক্ষিগত করে রাখবে? নিঃসন্দেহে এটি একটি অসম বণ্টন। এখন সময় এসেছে সুষম বণ্টনের। তাই এখন থেকে তোমরা হত্যা করলে তোমাদেরকেও হত্যা করা হবে, তোমরা গোলাবর্ষণ করলে অনুরূপভাবে তোমাদের বিরুদ্ধেও গোলাবর্ষণ করা হবে। যত কিছু তোমাদের অপছন্দের, তেমন সব বিষয়ের সুসংবাদ (!) তোমরা গ্রহণ কর'।

আমেরিকানদেরকে হত্যা করতে কারো কাছে জিজ্ঞেস করবে না। আল্লাহর বরকত নিয়ে সামনে এগোতে থাকো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আলাইহিস সালামের সান্নিধ্যের যে প্রতিশ্রুতি তোমাকে দান করেছেন, তা স্মরণ করে এগিয়ে চলো'।

'আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর বুশ দিয়েছে পরাজয়ের। আমরা দেখতে চাই কার প্রতিশ্রুতি সত্য? এটা ঠিক আছে আমেরিকা একটি মহারাষ্ট্র, কিন্তু বিবেক বুদ্ধির দিক থেকে তারা নিতান্তই অপরিপক্ক ও প্রতারণার শিকার। যুদ্ধবিমান, সামরিক সরঞ্জামাদি ও ভারী ভারী বোমার কারণে সে শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু মনোবলের দিক থেকে সে খুবই দুর্বল'।

আমীরুল মু'মিনীন
মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ

আমীরুল মু'মিনীন
মোল্লা আখতার মানসূর রহিমাহুল্লাহ

'আমাদের হাতে তো দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে; রাজত্ব এবং শাসন ক্ষমতা আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। আত্ম-বিসর্জনের ভার আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল-এর কাছে তাওফিক ভিক্ষা চাই। অনেকেই মনে করে, এই পদটি বিরাট মর্যাদার বিষয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এটি একটি বড় আপদ, যা আমার উপর আপতিত হয়েছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তা অবশ্যই আসবে। আজ হোক কাল হোক, আমাদের চলে যেতেই হবে'।

শায়খ আবু ইয়াহইয়া লিবী রহিমাহুল্লাহ

‘যত বড় বিপদই আসুক, যতই ঘোর বিপর্যয় নামুক, জিহাদের পথে যত রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হোক, তা যেন ক্লান্তি ও অবসাদ, দুর্বলতা ও অবসন্নতা, কর্ম পরিত্যাগ এবং শত্রুর কাছে নতি স্বীকার ও তার আনুগত্য মেনে নেওয়ার কারণ না হয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের খুব বেশি প্রয়োজন, যাতে প্রাণঘাতী এ সমস্ত রোগ দূর হয়ে যায়। এমনিভাবে আরও প্রয়োজন হলো প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার, আলস্য ও উদাসীনতার সকল উপাদান দূরীভূত করার এবং মনের মাঝে খারাপ কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে এমন সবকটি জানালা বন্ধ করে দেওয়ার’।

“কেউ যেন মনে না করে, জিহাদের পথে যাত্রা খুবই আরামদায়ক। সর্বত্র ও সর্বক্ষণ সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য, ধারাবাহিক বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সার্বিক সুখ সাফল্যের মধ্য দিয়েই যেন তা এগিয়ে চলে! এমনটা মনে করলে বিপদের প্রথম আঘাতেই আল্লাহ সম্পর্কে ব্যক্তির বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হবে। সে মনে করতে আরম্ভ করবে, আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা। আর এভাবেই সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। তার অবস্থা হবে পূর্ববর্তী সেসব দুর্বল ঈমানদারের ন্যায় যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا

‘বরং তোমরা ধারণ করেছিলে যে, রাসুল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ি-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়’। [সূরা ফাতহ,৪৮: ১২]

শায়খ উমার আব্দুর রহমান রহিমাহুল্লাহ

‘হে আমার ভাইয়েরা, তারা যদি আমাকে হত্যা করে—আর কোনো সন্দেহ নেই যে তারা তা করবেই—তবে তোমরা আমার কফিন অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসবে। আর আমার মরদেহ আমার পরিবারের কাছে পাঠাবে। কিন্তু, তোমরা আমার রক্তকে ভুলে যেও না এবং তা বৃথা যেতে দিও না; বরং আমার পক্ষে তাদের থেকে তোমরা চরম ও কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। তোমরা, তোমাদের এক ভাইকে স্মরণ রাখবে যে সত্যের বাণী উচ্চারণ করে আল্লাহর পথে নিহত হয়ে গেছে। এই কয়েকটি কথা ওসিয়ত হিসেবে আমি তোমাদের কাছে বলে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের তৌফিক দিন। তোমাদের কাজে বরকত দান করুন। আল্লাহ তোমাদেরকে হেফাজত করুন এবং বিজয় দান করুন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ’।

আমীরুল মু’মিনীন
মোল্লা হিবাতুল্লাহ আখুন্দযাদাহ হাফিযাহুল্লাহ

‘মুজাহিদদের কর্তব্য হলো, আমাদের প্রয়াত দুজন প্রিয় নেতা আমীরুল মু’মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ এবং মোল্লা আখতার মানসূর রহিমাহুমাল্লাহ—তাঁদের উভয়ের দেখানো মানহাজ অনুসারে পথ চলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা। মুজাহিদরা যেন মুসলমানদের খিদমাহ, জনসেবা ও জনস্বার্থে কাজ করাকে একটি দ্বীনী খেদমত এবং নিজেদের সর্বোচ্চ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করে’।

وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর
এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

(সুরা আল ইমরানঃ ১০৩)

AL HIKMAH MEDIA